নারীর প্রশ্ন

'সর্ব্বহারা'

প্রিণ্টারস্ এণ্ড পাব্লিশার্স
প্রেস এণ্ড লিটারেচার লিঃ
৮, ওল্ড্ পোষ্ট অফিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১

মুদ্রাকর—
কে. চৌধুরী, ডাইরেক্টর

সর্ব্বস্বত্ব লেখক কর্ত্তৃক
সংরক্ষিত

দাম ৩।।০
সাড়ে তিন টাকা

উপহার ____________________

সর্ব্বহারার আর একখানি

:—"পাক-চক্র"—

আপনাদের সহানুভূতির প্রতীক্ষায়।

কৃতজ্ঞতাঃ—

যথার্থ সাহায্য পেয়েছি যাদের—

১। শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়

২। প্রচ্ছদ-পট শিল্পী—শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

উৎসর্গ

অচেনা জগতে নেমে আসতেই দু'হাত বাড়িয়ে সকলের আগে অসহায় আমাকে যিনি তুলে নিলেন তাঁর স্নেহভরা বুকে,— ভাল-মন্দ কোন কিছুর বিচার না করেই, সেই দেবী,— মায়ের শ্রীচরণে।

মুখবন্ধ

লেখক ব'লে পরিচিতির লোভে লিখ্‌তে বসিনি; দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা পথের আশে পাশে যে বাস্তব সত্য প্রত্যক্ষ করেছি, আরও দশজনার কাছে তাই পৌঁছে দেবার আগ্রহ থেকে নিজেকে সংযত করতে পারলাম না বলেই এ প্রচেষ্টা। যদি বিন্দুমাত্রও আনন্দ লাভ করেন কেহ, কিম্বা উপকার পান এতটুকুও, ধন্য বোধ করবো নিজেকে।

অভিজ্ঞতাবিহীন প্রাণে মস্ত একটা আশা ছিল যে, সর্ব্বপ্রকার ভ্রম-প্রমাদ বিহীন হয়েই বেরুবে এ। কিন্তু সে আশাও ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল একেবারে; আর কোনদিন এতটুকু লেখাও ছেপে বেরোয়নি আমার, তাই বুঝতে পারিনি কত ঝঞ্ঝাট এর পশ্চাতে।

নূতন লিখছি জেনে প্রকাশকেরা আঁৎকে পিছিয়ে যান সর্ব্বহারার আবেদন শুনে। নাছোড়বান্দা হ'য়ে ঝাপ দিলাম নিজের সাহসে, আর দুর্ভাগ্যও ঝাঁপিয়ে পড়লো সাথে।

দুইবছর আগে নিজের দায়িত্বে বইখানি ছাপতে দিলাম এক বন্ধুর পরামর্শে, উচ্চ-শিক্ষিত কোন এক বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানের কাছে। অগ্রিম টাকাও দিলাম অনেকটা। আর তিনি কাজ গুটিয়ে সরে পড়লেন টাকাটা নিয়ে।

শরণ নিলাম এক আইন ব্যবসায়ীর। ক্ষেত্র বুঝে তিনিও ঠকিয়ে নিলেন কিছুটা অর্থ। 'হা, হতোস্মি' ক'রে হাল ছেড়ে দিতেই বন্ধুবর পরামর্শ দিলেন আইনের আশ্রয় নিতে।—আবার অর্থদণ্ড!

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে চললো দুইটি মোকদ্দমা,— কাজ গুটালেন যিনি, আর সেই আইন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়ে সুদীর্ঘ দিন পরে তারা বাধ্য হলেন আপোষ মীমাংসায় আসতে। কিন্তু তখনও সেই দুর্ভাগ্যের পেছনতাড়া। শ্রেষ্ঠ গুরু পরমাত্মীয় পিতৃদেব আমায় ছেড়ে চলে গেলেন পরপারে ছেড়ে গেলেন আরও দুই একজন আত্মীয় বন্ধু, হারালাম অনেককিছুই। ঘিরে বসলো শারীরিক, অসুস্থতা।

— সুযোগ বুঝে আমার পক্ষের উকিলও ছাড়লেননা পুরস্কারের মাত্রাটা বাগিয়ে নিতে। 'সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি' করে ফিরিয়ে পেলাম টাকাটা দু'জনার কাছ থেকে। কিন্তু, ফিরিয়ে পেলাম না আর আমার সে উৎসাহ,— ফিরিয়ে পেলাম না পাণ্ডুলিপির সবটা। খোঁড়া হ'য়ে পড়ে রইলো দশজনার কাছে বেরুবার আশা থেকে।

কিন্তু, দুর্ভাগ্য তাই ছাড়ে কি? আবার এক বন্ধুর খোঁচানিতে হাতড়ে হাতড়ে লিখে দিলাম 'প্রেস' এ।

আঘাতে আঘাতে সবদিক দিয়ে পড়েছি এমনি নিরুৎসাহ হয়ে যে, অবস্থার চাপে উৎসাহ কিম্বা সময় কোনটাই ক'রে উঠতে পারলাম না প্রুফ্‌টাও ঠিক ঠিক দেখে দিতে। তাই শত শত ভুল ত্রুটী নিয়ে বেরিয়ে দাঁড়াল সকলের সামনে। মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি সেজন্য পাঠক পাঠিকাদের কাছে।

সর্ব্বহারার আবেদন ভগবানের আসন পর্য্যন্ত পৌঁছায় কিনা সন্দেহ। খ্যাতনামা পুরুষদের আসনও কম উর্ধে নয়। অজ্ঞাত সর্ব্বহারার আবেদন অতদূরেও পৌঁছুলো না। তাই নিজের রিক্ত ডালি নিয়েই সে বেরুলো দশের কাছে— কারোও সার্টিফিকেট ছাড়াই।

আর জানাচ্ছি, যে হতভাগিনীর জীবন ছায়া অবলম্বনে এ প্রচেষ্টা, তার পরিনতি যে এরই ফাঁকে কী ভীষণ মর্ম্মন্তুদ হ'তে পারে তা কল্পনাও করতে পারিনি আমি। সেই অভিশপ্তার ছায়া অবলম্বন করেছি বলেই কি সর্ব্বহারার প্রচেষ্টায়ও ভগবানের অভিশাপ!

তাই যদি:- তোমার আসনে যদি কোনও আবেদন পৌঁছায়, তবে, হে ভগবান! স্থান দিও তোমার শান্তিময় শ্রীচরণে ওই অনাথা অভিশপ্তার পরলোক গত আত্মাকে। আর দৃষ্টি রেখো,- তেম্নি অভিশপ্তাদের প্রতি, ইতি.

'নববর্ষ' 'সর্ব্বহারা'

বাং, ১৩৬০ সন।

নারীরপ্রশ্ন

—(*)—

—এক—

আমরা, যারা—মানব সমাজের উচ্চ-স্তরের অধিকার দাবী নিয়ে ব'সে আছি, সমাজের নিম্নস্তরের লোক গুলোকে এতটা অবজ্ঞা ক'রে আসছি যুগ যুগান্তর থে'কে, যেন এই অবজ্ঞা ওদের ন্যায্য প্রাপ্য, প্রাক্তণ কর্ম্মজাত অভিশাপ!—কিন্তু, যতই কেন অভিশপ্ত হোক না ওদের জীবন, ওদের নির্ব্বংস হওয়াটাও—আমাদের কাম্য নয়; ——আমাদের সেবার জন্য ওদের চাই যে! তাই, এই অবজ্ঞা অভিশাপের ভিতর দিয়েও ওদের বেঁচে থাকাটা অভিপ্রেত বটে—

এর চাইতে ও তীব্রতর অবজ্ঞার বোঝা, সহজাত অভিশাপ বহণ করে আসছে—আর একটা জাতি আমাদেরই এই উচ্চ স্তরের হিন্দু গৃহে, যাদের জন্মটা মোটেই আমরা কামনা করি না কিন্তু সেবাটি লোভনীয়।—তাই এক একবার মনে হয়,—এদের বাস্তব জন্মটা বাদ দিয়ে শুধু যদি নারীত্বের অস্তিত্বটা সম্ভব হ'ত তা' হলেই আর কোন দুঃখ ছিল না।

এর প্রশ্ন যেখানে স্বাভাবিক, 'কেন'—তারই উত্তর দিতে জন্মেছিল এম্নি অবজ্ঞাতা একটি মেয়ে উচ্চ ভদ্র গৃহে,—চন্দনগরের রায়বংশে,— সহজাত অবজ্ঞা আর অভিশাপ মাথায় ক'রে।

* * *

নারীর প্রশ্ন

নৃসিংহ রায় অতিশয় হিসেবী লোক ;—বিশেষ করে তারই চেষ্টায় রায় বাড়ীর পূর্ব্বপুরুষোপার্জ্জিত বিত্ত ও প্রভুত্ব উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে। —বিরাট বপু, বেটে ধরনের পিটে গড়ণ গায়ের রং ফর্সা তো নয়ই তাই ব লে একেবারে আবলুস ও নয় ;— টাক পড়া মাথায় লোম বিহীন ভ্রুর নীচ থেকে এক জোড়া গোলচক্ষুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি যখন হানেন, তখন বুঝতে আর বাকী থাকেনা যে নৃসিংহ রায়ের এত বড় সুখ সম্পদ গড়ে তোলবার যে অপবাদ কাহিনী, তা নিছক মিথ্যা হওয়া সম্ভব নয়।—পুত্র সন্তান কিছুই তার লাভ হয়নি।—

ছোট ভাই প্রেমেন হিসেবী তো নয়ই, আকার প্রকারেও বড় ভাই এর বিপরীত ;—সুশ্রী সুপুরুষ তাকে বলা চলে। হৃদয় ব'লেও তার একটা কিছু আছে যার জন্য সবাই তাকে ভালবাসে।

সংসারের আয়-ব্যয় হিসাব-নিকাশ, শাসনতন্ত্রের যাবতীয় ভার ঐ দাদারই হাতে ; কারও সাধ্য নাই সেই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে মুখটি তুলে উত্তর দেয়। —পাড়ার বৌ ঝিয়েরা আব্দারে ক্রন্দনরত ছেলেদের ঠাণ্ডা করতে ঐ বড় বাবুর নাম করলেই চুপ; একেবারে মন্ত্রের মত।—

মেজ ভাই গৌরিশঙ্কর অর্দ্ধসন্ন্যাসী ; এ আশ্রম সে প্রতিষ্ঠান করে দিন কাটান। সংসারের সঙ্গে তার বড় একটা সম্পর্ক নাই, —বাড়ীতেও বিশেষ থাকেন না;—অবিবাহিত।—

নৃসিংহ রায় একার চেষ্টাতেই এতটা উন্নতির জন্য গৌরবও অনুভব করেন যথেষ্ট।

(*)

নারীর প্রশ্ন

দুই

রায় বাড়ীর ভরাসংসারে চারিদিকে যখন সবকিছুতেই কেবল উন্নতি আর সুখ,—বিরাট সুখৈশ্বর্য্যের ভবিষ্যৎ উন্নতি আর না হোক্, তার ভোগ পরিনতির,—পিতৃপুরুষের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট জলপিণ্ড ব্যবস্থায় সবাই যখন একজনার আগমন প্রতীক্ষায় আশান্বিত, তখনই জন্মালো অশান্তির বংশ রক্ষক— (বংশ রক্ষিকা ?) প্রেমেন রায়ের প্রথমা কন্যা সুমিত্রা।—

সকলেরই প্রাণে আঘাতটা কিছু কম লাগলো না। কিন্তু, 'সবেধন নিলমনি';—তাই আদর যত্নের ত্রুটি নাই। এই তো আশার শেষ নয়! ওদিকে বড় বৌএর ও 'নাই চেয়ে কানা মামা ভাল'; —সুতরাং সুমিত্রা জ্যাঠাই মার ও প্রিয় পাত্রী কম নয়।

একে একে চারিটি মেয়ে জন্মাবার পরে মায়ের বুকে ওযখন ওর আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দিল, উন্মুক্ত পৃথিবীর সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে তখনও যখন চোখোচোখি পরিচয় হয়নি,- একটা ক্ষীণ, আশা কেউ বা মনে পোষণ ক'রে আসছিলেন। আবার কেউ বা বলছিলেন, 'পঞ্চরত্ন' এবারে পূর্ণ হবে; পঞ্চ কন্যা স্মরেনিত্যং, ইত্যাদি ইত্যাদি।", মায়ের প্রাণ কিন্তু ব্যথিয়ে উঠে এ সব আলোচনায়; আর সেই ব্যথার অন্তরালে আশার ক্ষীন প্রদীপটিকে জালিয়ে রাখেন সংগোপনে।

প্রেমেন রায় মেয়েদের এত টুকু ও অনাদর করেন না কোন দিন,—অথবা কার ও সেরূপ ব্যবহার মোটেই সইতে পারেন না। জ্যাঠামশাই নৃসিংহ রায় ও সেরূপ ভাব প্রকাশ করেন নি কখন ও!

নারীর প্রশ্ন

ওর আগমন সংবাদ যখন মায়ের সর্ব্বশরীরে স্পষ্ট হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো, তখনই ও নিজের অবজ্ঞাত-জীবনের প্রথম পরিচয় লিপি পাঠিয়ে দিল ওই যবনিকার অন্তরাল হ'তেই, — অগ্রদূত রূপে পিতার মৃত্যুকে পাঠিয়ে দিয়ে।

ভরা সুখের সংসারে এমন একটা শোকাবহ ঘটনা কী যে দুঃখের প্লাবন সৃষ্টি ক'রে গেল তা কল্পনাতীত। —এই কঠোর প্রভুত্ব বিস্তারি সংসার খানির ভিতরে, ঘরে-বাইরে পীড়িত জনার মূর্ত্তিমান করুণাটুকু, পিতৃ, পিতামহের অর্জ্জিত কীর্ত্তিকলাপ বাঁচিয়ে দশজনার কাছে পরিচয় দিবার ক্ষীণ একটা আশার সঞ্চার ক'রে রেখে নির্ম্মূল হ'য়ে গেল।

আশার সুলক্ষণ তো মোটেই নয়! যার আগমনের পুরোভাগেই শোক প্রবাহ ছুটে চলে, — যে পৃথিবীর বুকে পা, না বাড়াতেই বাপকে খেয়ে বসে, সে কি আর রাক্ষুসী না হয়ে যায়! —যদি বা ছেলেও হয়, তবু ও সে অলক্ষুণে, — কিন্তু তার অপরাধ মার্জ্জনীয়।—

একের বিনিময়ে আর একটি নব আশার মুকুলকে আশ্রয় ক'রে সকলের বুক এক একবার ফুলে ওঠে; —মায়ের বুক ও। —ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পুর্ব্বাভাষ জনক জননীর বন্দীত্ব, — মহা প্রলয়ঙ্করী ঝড়বৃষ্টিময়ী আমানিশা! কিন্তু, তবু, নিরাশাই যে বেশী; — নইলে মায়ের কপাল ভাঙ্গবে কেন? —অথবা সোনার চাঁদ কোলে তুলে দিবেন বলে ভগবান অমূল্য মনি কেড়ে নিলেন!—

* * *

তারপরে একদিন সমস্ত আশা নিরাশায় দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে যবনিকার অন্তরাল হ'তে ও যখন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালো, — সকলের

নারীর প্রশ্ন

অপরিসীম বিতৃষ্ণার মাঝখানে রায় বংশের উন্নত প্রভুত্ব ভবিষ্যতের স্থিতি সব কিছুই যেন শেষ হতে বসলো।

আতুড় ঘরে দেখতে এসে ওর পরিচয় জেনে সবাই ঘৃনায় মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে লাগলো, কেউ বা আতুড় ঘর পর্য্যন্ত এলেনও না ওকে দেখতে ;- ঠাকুর মা ও না।—

চক্ষু নিমীলিত অবস্থায় মা নিজের মৃত্যু কামনা করলেন ; স্বামীর শোক আজ আবার নূতন ক'রে হৃদয়ে বেঁজে উঠলো।

ঠাকুর মা ওকে দেখতে এলেন না, সকলের মনের তিক্ততার ভার ওর ঘাড়ে চাপিয়ে সমস্ত অপরাধের জন্য ওকেই দায়ী ক'রে সবার কাছে অপরাধী পরিচয় করিয়ে দিতে ওর নাম রাখলেন, —"তিতা"।—

নির্দ্দোষ শিশুর প্রতি এ যে কত বড় অবিচার কত বড় অন্যায়, কত গভীর কলঙ্ক রেখা তার কপালে এঁকে দেওয়া তা কেউ কল্পনা ও করলে না। জ্যাঠা মশাই নৃসিংহ রায়ের হৃদয়েও দুর্ব্বলতা দেখা দিল।

এই ছোট্ট একটি শিশুর আবির্ভাব ওই বিরাট সংসারটিতে যে মহাপরিবর্ত্তণ এনে দিল, সর্ব্বজন প্রিয় ওই প্রেমেন রায়ের মৃত্যু ও তা সাধণ করতে পারে নাই।

* * *

মায়ের সঙ্গে যখন ওর প্রথম চোখোচোখি হ'ল, সে ওই আতুড়ের সামে দাঁড়িয়ে গৌরিশঙ্করের আনন্দ বিহ্বল চীৎকারে, — "এই কি না রাক্ষুসী ; — না রাক্ষস বিনাশিনী সাক্ষ্যাৎ উমা!"

নারীর প্রশ্ন

মা চোখ মেলে কোলে তুলে নিয়ে···শিউরে উঠলেন ওর রূপের ঝলকে।

—(*)—

তিন

সব মানুষই খেয়ালী কিছু কম নয়; — তৃষ্ণা বা বিতৃষ্ণাও তাই সব সময়ে মানুষের মনে সমান ভাবে আস্তানা গ'ড়ে ব'সে থাকতে পারে না।

"জীবনভর কঠোর সাধনার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য, - বংশ গৌরব সবই অনর্থক হ'য়ে যাবে শুধু একটী মাত্র পুত্র সন্তানের অভাবে। এই পাঁচ পাঁচটী মেয়ে না হ'য়ে একটা মাত্র ছেলেও যদি জন্মাতো তা হলেও যে সার্থকতায় পূর্ণ হ'য়ে উঠতো সব।" — ঈদৃশ চিন্তা নৃসিংহ রায়কে বড়ই অস্বস্তি বোধ করিয়ে তুলেছিল। ভ্রাতৃহারা হ'য়ে রায় মহাশয় বিচলিতও কম হননি। বৃদ্ধা মাতার করুণ আর্ত্তনাদ, ছোট বৌ এর অকাল বৈধব্য, পিতৃহারা শিশুগুলির ম্লান মুখচ্ছবি, সব কিছু মিলে রায় মহাশয়ের কঠোরতার মূলেও কম একটা আঘাত হানেনি। তিনি ওদের পানে চেয়ে এটাও বুঝেছিলেন যে তাঁর অবর্ত্তমানে ওদের সুখ-দুঃখের খোজ-খবর নেবারও কেউ থাকবে না। এই মর্ম্ম পীড়া ভ্রাতুষ্পুত্রী কয়টাকে আরও প্রিয়তরা ক'রে তুলেছিল।

উপস্থিত সর্ব্ববিধ ঘটনাচক্র মিলে রায় মহাশয়ের স্বার্থান্ধ হৃদয়েও জীবনের চতুর্থ ভাগে কিছুদিনের জন্য স্বভাবতঃই বুঝি বা সংসারের নশ্বরতা জ্ঞানের সঞ্চার করেছিল। তিনি স্থির করলেন, যেমন ক'রেই হোক স্বীয় জীবদ্দশাতেই সুপাত্রে অর্পণ ক'রে যাবেন মেয়েদের। উদাসী গৌরিশঙ্করের উপরে সংসারের কোন ভরসাই রাখেন না তিনি।

নারীর প্রশ্ন

এদিকে নবজাত শিশুর রূপ লাবণ্য স্বভাবতঃই সকলের অজ্ঞাতে তাদের স্নেহাকর্ষণ ক'রে চললো। ঠাকুরমাও পুত্রহারা বুভুক্ষিত অন্তরে ওদের জড়িয়ে একটা সান্ত্বনা পান বৈ কি!

'তিতা' যখন আধ আধ বোলে হামাগুড়ি দিয়ে মিষ্টি হাসি হাসে, বোনেরা আদর ক'রে ডাকে 'তিতু'। কেন যে ওর নাম তিতা রাখা হয়েছে সে কথাটা আর স্মরণ ক'রে নয়. ঠাকুরমাও সোহাগ ভরে ডাকেন 'তিতু'; জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা, মা-ও। ওর আদুরে নামই হয়েছে এখন 'তিতু'।

সর্ব্ব কণিষ্ঠা পিতৃ সোহাগ বঞ্চিতা ব'লেই জ্যাঠামশাই ওকে আরও বেশী স্নেহ করেন। তিতু জ্যাঠামশাইর কাছে কাছেই থাকে, ফায়ফরমাস-টুকু করে, গল্প বলে, বিরক্ত করে, আর করে পিতার মতই ভক্তি। একদিন তিতু প্রশ্ন করলো জ্যাঠামশাইকে,— "আচ্ছা জ্যাঠাইমনি,— রিণির জ্যাঠাইমনি নেই কেন? ওর বাবা আছে, আমার আবার বাবা নেই,— বাঃ;—বাবা না থাকলে কি হয় জ্যাঠাইমনি?" —

রায় মহাশয় সেদিন এ প্রশ্নের কোনই সদুত্তর দিতে পারিলেন না বালিকার কাছে। উপায় বিহীন একটা উত্তরে শুধু জানালেন;— "কিছুই হয় না। —ওই তো, রিণির জ্যাঠাইমনি নেই, ওর ও কিছুই হয় না তাতে"।

তিতুর বালিকা মন কি প্রবোধ গ্রহণ করেছিল এতে বলা যায় না, কিন্তু নিরুত্তরা বালিকার ম্লান মুখচ্ছবি দেখে রায় মহাশয় ঠিকই বুঝেছিলেন যে, পিতৃহারা অন্তর তার পিতৃস্নেহ ব লে একটা কিছু কল্পনা করে যতই কেন না স্নেহ আদর লাভ করুক সে অপরের কাছে। তাই

এই শিশুটার কথা ভাবতেই দু'চোখ তাঁর জলে ভ'রে আসে। ও যে বাপকে চোখেই দেখেনি কোন দিন; শুধু একদিন বুঝবে, ওর ও বাপ ছিল; কিন্তু কেমন মোটেই জানেনা তা।

(*)

চার

সেদিন দুপুরবেলা, খেয়ে-দেয়ে রায় মহাশয় শুয়ে আছেন বৈঠকখানা ঘরে, ঘুমোননি, —চক্ষু বুজে প'ড়ে আছেন গ্রীষ্মের আলস্যে। তিতু নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ ক'রে আস্তে ব'সে পড়লো বিছানার পাশে;— —স্নান ক'রে চুলের রাশ আর বাঁধা হয়নি।

জ্যাঠামশাইর অবস্থা দর্শন ক'রে শয্যা পার্শ্বস্থিত পাখা খানি তুলে একটু হাওয়া করতেই শীতল স্পর্শে চোখ খুলে চাইলেন তিনি ভ্রুকুটী ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে, বুঝি বা ভৃত্যের ত্রুটী সংশোধনার্থে। —কিন্তু দৃষ্টি পরিষ্কার হতেই জ্যাঠামশাই দেখতে পেলেন তিতুকে, —দৃষ্টি বদলে গেল। তিতু বলে,—

"তুমি ঘুমোওনি জ্যাঠাইমনি? —আমি ভাবচি তুমি ঘুমিয়েছ। তুমি ঘুমোও জ্যাঠাইমনি, আমি হাওয়া করি।"—

—বলতে বলতে আঁচলে জ্যাঠামশাইর ঘর্ম্মাক্ত দেহখানি মুছিয়ে দিয়ে হাওয়া করতে থাকে তিতু; ঠিক যেন ছোট ছেলেকে আদর ক'রে মুছিয়ে হাওয়া করছেন মা ঘুম পাড়ানোর জন্য।

জ্যাঠামশাই এতক্ষন শুধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন এই মমতা ময়ীর রূপের দিকে। আতুড় ঘরে গৌরিশঙ্কর সেদিন বলেছিলেন,— 'সাক্ষাৎ উমা',—আর আজ নৃসিংহ দেখলেন স্নেহময়ী মা।

নারীর প্রশ্ন

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলেন জ্যাঠামশাই,—"আমার এতটুকু কষ্ট হ'তে দেখলেই তো ছুটে আসিস্ তিতু ; কিন্তু, বল্ দেখি, তুই যখন চলে যাবি, কে আমায় এম্নি আদর ক'রে হাওয়া করবে ?"—

—"কেন ; দীনুদা, পুটি মাসী।"—

জ্যাঠামশাই একটু হাসিলেন ;—"ওরা কি আর প্রাণের টানে করে !"—

তিতু একথার ঠিক অর্থ বোঝে না, সে তো জন্ম থেকেই জানে 'দীনুদা এ বাড়ীর দীনুদা', 'পুটি মাসী এ বাড়ীর পুটি মাসী'। তাকে তো এরাই কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছে, আজিও কত স্নেহ সোহাগ করে। —যাক্, তথাপি সে জ্যাঠামশাইকে উত্তর দিতে নিজেকে গুছাইয়া লইল। বলিল,—

"তবে কোথাও যাব না, বড়দি আমায় নিতে চেয়েছে সেখানেও যাব না কোথাও না : —মামা বাড়ীও না।"—

জ্যাঠামশাই পুনরায় একটু হাসিয়া বলিলেন, —"তা নয়রে পাগলি ! এই সুমি যেমন গেছে, আনু গেছে ; ওদের বিয়ে দিয়ে যে কতটা শূন্য বোধ করছি ! নিজের স্নেহ মমতা দিয়ে গড়ে তুলে পর ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছি : পরের মুখের পানে তারা আজ চেয়ে আছে।" রায় মহাশয় এইখানে ছোট্ট একটুখানি দীর্ঘ শ্বাস ফেলিলেন। ওদের বাল্য বিবাহ দিয়ে হৃদয়ে একটা বিচ্ছেদ মাখানো দুশ্চিন্তা অনুভব ক'রে আসছেন তিনি। এই ফাঁকে জবাব দিল তিতু,—

—"কেন, তারা বুঝি দিদিকে আদর যত্ন করে না ? জামাই বাবু তো দিদিকে খুব ভালবাসেন.—ঠাকুরমা বলেছেন।"—

নারীর প্রশ্ন

—"জ্যাঠাইমার কাছে, আমার কাছে যেমন আব্দার ক'রে খাবার চেয়ে খেয়েছে, ছোট্টটি থেকে যে সোহাগে তারা মানুষ হয়েছে সেখানে কি আর তাই পাবে, না তারাই আমাদের মত সে আব্দার সহ্য করবে!"—

তিতু এসব কিছুর কোনই জবাব দিতে পারে না, সে এখনও শিশু। স্নেহান্ধ—রায় মহাশয় নিজেই বুঝিতে পারিতেছেন না, যে স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় প্রেমের দাবী বড়, না বাৎসল্য – পূর্ণ স্নেহের অকপট আব্দারই শ্রেষ্ঠ। মাতা পিতার স্নেহ বুভুক্ষিত অন্তর তার সন্তানকে চিরদিন এম্নি অসহায় শিশুটি ক'রেই দেখে,—তাই মা চিরদিনই মা,—পিতা চিরদিনই পিতা।—

রায় মহাশয় আবার বলিতে থাকেন, "এক এক বার ভাবি তোকে বিয়ে না দিলে কেমন হয়রে তিতু? বিয়ে দিলেই তো চ'লে যাবি, আর আমরা এই শূন্য পুরীতে পড়ে থাকবো! —কিন্তু, এ যে পাড়াগাঁ, এখানে কি আর মেয়েদের বিয়ে না হ'লে চলে!"—

তিতু যেন একটু ভেবে চিন্তে উত্তর দেয়,- "মেয়েদের কি বিয়ে না হলেই নয় জ্যাঠাইমনি? মেজ জ্যাঠাইমনি যে বিয়ে করেন নি! বেশ তো,—আমিও বিয়ে করবো না।"—

—"সে যে ব্যাটাছেলে"। মৃদু হেসে উত্তর দেন জ্যাঠামশাই। নিরুপায় ভাবে কি যেন ক্ষনিক চিন্তা করে তিতু, তার পরেই বলে, —"বইএ তো পড়েছি, সুলতানা রিজিয়াকে তার বাবা ছেলের পোষাক পরিয়ে ঘোড় দৌড় শিখাতেন; লেখা পড়াও শিখিয়ে ছিলেন। পরে

তিনিই দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন রাজা হয়ে। আমাদের তো ভাই নেই, আমিও তার মত লেখা পড়া শিখে আমাদের কাছারীতে বসবো ছেলে সেজে ; – তুমি আমায় শিখিয়ে দিও জ্যাঠাই মনি।”

—“মেয়েদের কি আর এতটা সাজে” ?

“কেন সাজে না, বল না ! তিনি তো এত বড় একটা রাজ্য চালাতে পারলেন, আমি পারবো না ?” –

জ্যাঠামশাই কোন উত্তর দিচ্ছিলেন না, তিতু পুনরায় ব'লে চলে,—“সত্যই জ্যাঠাইমনি, আমাদের যদি একটি ভাই থাকতো ! আমায় বিয়ে দিলে তোমাদের কে দেখবে !”—

বালিকার সরল হৃদয়ে একটা মহাদুশ্চিন্তার রেখা পাত হচ্ছিল। তার বিয়ের সঙ্গে এ সংসারের কত কি যেন জড়িত, তারই শেষ মীমাংসায় শিশু মন তার অতিষ্ট।—

রায় মহাশয় এতক্ষণ চিন্তা করিয়া যেন এই কনিষ্ঠা কন্যাটি সম্বন্ধে একটা মীমাংসায় পৌঁছিলেন, এবং স্বীয় মতটা স্বগতঃ ভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে তিতুকে একজন সমঝদার শ্রোতা হিসাবে আপন মনেই ব'লে চল্লেন,—“তার চাইতে ভাল হয়, বিয়ে না দিলেই যখন নয়,—একটি ভাল ছেলে খুঁজে তোকে বিয়ে দিয়ে এই সংসারেই রাখা। তা হলে সবদিকই বজায় থাকে,—নইলে আর কূল দেখছি না।—”

তিতু ইহার কোনই জবাব দেয় না। এ সমস্ত কথার বাদ প্রতিবাদ করিবার মত বয়স এবং শিক্ষা কোনটাই তার লাভ হয় নাই। জ্যাঠামশাই নিজের ভাবেই আবার বলিতে থাকেন—“বৌমাও

নারীর প্রশ্ন

সেদিন এই কথাই বলেছিলেন, আমিও ভেবে দেখেছি। —শেষ পর্য্যন্ত দেখলাম এই কথাটাই ঠিক। —ছোট বৌএর ও কষ্ট হবে না, তুই তার কাছেই থাকবি, একট্রি ছেলেও আমরা পাব;—সংসারটাও'—রক্ষা পাবে,—কেমন ?"—

এবারেও কোন প্রকার উত্তর দিতে পারে না তিতু; —কিন্তু, একটা কিছু বুঝতে পারে যে' বিয়ে হয়ে সে চ'লে গেলে মা, জ্যাঠাইমণি সকলে দুঃখ পাবেন। —তিতুকে নীরব দেখিয়া জ্যাঠামশাই যেন বুঝিয়া লইলেন—"মৌনং চ সম্মতি লক্ষনং"। —অর্থাৎ আপন মনে পরামর্শ আঁটিয়া আপনিই একটা সমাধানে পৌঁছাইয়া রায় মহাশয় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন—"সেই ভাল।" এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা সমাধানান্তে যেন একটা আরাম লাভ করিয়া কাৎ ফিরিয়া শুইতে শুইতে বলিলেন,—"আর একটু হাওয়া কর দেখি,—একটু ঘুমানো যাক্"।

পাশের হবিষ্যি ঘর হইতে মা জ্যাঠা-ভ্রাতুস্পুত্রীর কথোপকথন শুনিতেছিলেন। —স্বল্প কাল মধ্যেই মৃদু হাওয়া স্পর্শে তন্দ্রাভিভূত রায় মহাশয়ের নাসিকা গর্জ্জন শোনা গেল। —মা ডাকিলেন, —"তিতু" !

আস্তে 'যাই' বলিয়া নিঃশব্দে হাতের পাখাখানি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তিতু চলিয়া গেল।—

মা প্রশ্ন করিলেন,—"জ্যাঠাইমনি ঘুমিয়েছেন ?"

—"হ্যাঁ"।—

—"এইবার খাবি বস্" ।

নারীর প্রশ্ন

– "তুমি এখনও খাওনি যে!"–

—"জ্যাঠাই মনির সঙ্গে কথা হচ্ছিল; ভাবলাম উনি ঘুমুলেই ডাকবো। – আজ সকালেও কিছু খাস্‌নে যে!"

– "তুমিও তো রোজ সকালে কিছুই খাওনা, এম্নি দেরী করে করেই খাও।"–

মা ইহার কোনই সদুত্তর করিতে পারেন না। – প্রত্যহ সকালে জল খাবার খাইয়া মাছ রান্নার ঘরে খায় তিতু, দশটায় স্কুলে যাইবার পূর্ব্বে। কিন্তু ছুটির দিনটিতে সে আর মাছের ঘরে খায় না, মায়ের সঙ্গে খাবে ব'লে! – মাকে বলে, —"তবে তুমিও কেন খাওনা সকালে; – পুটি মাসী, জ্যাঠাইমা সবাই তো খায়? —তবে আমিও খাব না।"–

মায়ের প্রাণ ব্যথায় কেঁদে ওঠে। হ'লই বা ওই ছুটির দিনটাই শুধু। —হিন্দুর ঘরের মেয়ে, কে বলতে পারে যে এম্নি কতটি দিন কাটাতে হবে না জীবনে! কথাটা মনে হ'তেই মায়ের প্রাণ শিউরে ওঠে আতঙ্কে। —একবার ভাবেন, তার চাইতে বিয়ে না হওয়াই মঙ্গল!

তখন খাবার সাজানো হ'য়ে গেছে; মায়ের চোখদুটী জলে ভ'রে আসছিল, মেয়ের অজ্ঞাতে আঁচলে চোখ দু'টি মুছে নিয়ে বল্লেন, —"আর দেরী করবি না, ব'সে পড় এইবার। তারপর মায়ে ঝিয়ে খেতে বসেন একই সঙ্গে।

—(*)-

নারীর প্রশ্ন

পাঁচ

চন্দনগড় গ্রামখানি পাড়াগাঁ হলেও ভদ্র লোকের বসবাসে, শিক্ষা দীক্ষায় সহর বাসীর ঘৃনার উদ্রেক করে না।— রাস্তা-ঘাট হাট-বাজার পোষ্ট-অফিস, ডাক্তারখানা, নদী, পুকুর, কোনকিছুর অভাব নাই।— একটি স্কুলও আছে,— খেলার মাঠও।— প্রায় সব শ্রেণীর লোকই গ্রামখানিতে বাস করে। আর এই রায় বাড়ীতে 'বার মাসে তের পার্ব্বন' লেগেই আছে। দোল, দুর্গোৎসব, বাসন্তী উপলক্ষ্যে খাদ্য খাওয়া, কবি আর যাত্রা গানের ধূম পড়ে যায়,— গ্রামখানি জম জম ক'রে।—

গ্রাম থেকে সামান্য কয়েক মাইল দূরে ছোট্ট একটি শহর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গ্রামের ছেলে মেয়ে অনেকেই শহরে স্কুল কলেজ করে,— কেউ বা পায়ে হেটে, কেউ বা সাইকেল চ'ড়ে। —তিতু গ্রামের স্কুলেই পড়ে, লেখা পড়ায় বেশ ভাল। অশোকও এই একই স্কুলে পড়ে, তিতুর দুই শ্রেণী উপরে।

পিতার একমাত্র ছেলে অশোক; বংশের দুলাল, অতিশয় আদুরে। ছেলেবেলা থেকেই বাপ-মা তার অদ্ভুত সব আব্দার সয়ে আসছেন, আজিও তাই তার আব্দারের সীমা নাই। পিতার অর্থ আছে, অগাধ না হ'লেও কোন কিছুর অভাব হয়না,- আর আদুরে ছেলে ব'লেই অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত ও হন না। বরং, সাজিয়ে গুজিয়ে ছেলেকে অন্যের চাইতে জমকালো ক'রে রাখতেই গর্ব্ব বোধ করেন।

নারীর প্রশ্ন

পিতার মুখে পুত্রের প্রশাংসার অন্ত নাই: অশোকও তাই নিজের বিদ্যা এবং ধনগৌরবে অহঙ্কৃত খুবই।—

পোষাক পরিচ্ছদ তার নানা ধরণের।—কোট-প্যাণ্ট, লুঙ্গি-পায়জামা, শার্ট-চশমা, ধুতি-পাঞ্জাবী' স্যাণ্ডেল বুট—পাড়াগাঁয়ের লোকদের তাক লাগিয়ে দেয়।—যদিও কলিকাতা সে শুধু মানচিত্রেই—দেখিয়াছে তবু কলিকাতার সমস্ত ফ্যসান্ তার কণ্ঠস্থ!— কেমন পোষাক প'রে কি ক'রে হাটতে হয়, তার ও কসরৎ সে দেখায়। লোকে বলে,—"এক বাপের এক ব্যাটা, স্ফুর্ত্তি করবে বৈকি?"—

অশোকের পিতা মুকুন্দ দত্ত অনেক দিন থেকে আশা ক'রে আছেন, রায়দের সঙ্গে একটা কুটুম্বিতে সম্পর্ক ক'রে নিতে পারলেই—ব্যাস্। এই সম্পর্কটা যে একে বারে না পাতিয়েছেন তাও নয়; তিনি নৃসিংহরায়কে ডাকেন দাদা আর তাঁর মাকে ডাকেন কাকিমা বলে। তাদের এই সম্পর্কটা যে নিছক পাতানো নয়;—তারও একটা মৌখিক ঠিকুজী তিনি বলেন। "ওই রায় বংশ আর এই দত্তবংশ একেবারে ছাড়াছাড়ি ও নয়। সাত পুরুষ পেরোয় নি এই ছয়পুরুষে পড়েছে মাত্র।"— এবং এই সম্পর্কটা বিশেষ করে ফুটিয়ে তুলতে পূজা পার্ব্বনে সদাসর্ব্বদা রায় বাড়ী উপস্থিত থেকে হাকে-ডাকে ঘনিষ্টতার বাহাদুরী প্রকাশ করেন। রায় গিন্নীও মুকুন্দকে নৃসিংহের পাশে বসিয়ে খাওয়ান।

অশোককে ও দত্ত ছেলে বেলা থেকেই সদাসর্ব্বদা রায় বাড়ীতেই রাখতে চেষ্টা করতেন; অন্য ছেলের সঙ্গে মিশতে দিতে চান না। খেলা-ধুলা অশোক করে রায় বাড়ীতেই আনু তিতুদের সঙ্গে।

এম্নি ক'রে শিশুকাল থেকেই রায় বাড়ীতে অশোকের অবাধ গতি একটা স্নেহের দাবী গ'ড়ে বসেছে। কিন্তু, একটু বয়স হ'তেই দেখা গেল, তিতু একটু ভাবুকতা প্রবণ,—অশোক চঞ্চল। তাই, সময় সময় শৈশবের সৌহার্দ্দ্যকে তিতু যেন এড়িয়ে চলে কৈশোরে।

সম্পর্কটা পাকাপাকি ক'রে নিতে মুকুন্দ দত্ত মনে একটা আশার আলেখ্য এঁকে তুলেছিলেন; এবং মনের পর্দ্দায় উহা বেশ একটা স্পষ্ট ছাপই দিয়ে চলেছে।

—'বংশের ব্যবধান, সেটা তো খুব বেশী কিছুই নয় —তিতু রূপবতী, লেখাপড়া শিখছে। —তা অশোকই বা কম কিসে! লেখাপড়া সেও করছে; রূপ যে তারও না আছে তাও নয়। অর্থ? উদ্যোগী পুরুষের হাতে অর্থ হতে কতক্ষন! —অশোকের কে এক মামা পুলিশে কাজ করেন, দারোগা। —তিনি তো গিন্নিকে কথা দিয়েছেন অশোককে পুলিশে একটা কাজ পাইয়ে দেবেন। —অশোকও যদি একজন দারোগা হ'য়ে দাঁড়ায় তবে ঐ রায়দের মত অবস্থা হ'তে কতক্ষন!—

এই সব স্থির ক'রেই, সেদিন যখন অপ্রত্যাশিতভাবে সেই মামাবাবু, দারোগা সাহেবটি সম্পর্কিত ভগ্নীপতির বাড়ী অকস্মাৎ পদধূলি দান করলেন, তৎক্ষনাৎ দত্ত মশাই তাকে সঙ্গে করে রায় বাড়ী চল্লেন, রায় মহাশয়কে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে।

দারোগা পুলিশ এ তল্লাটে এলে এই রায় বাড়ীতেই তাদের ঘাটি স্থাপনা হয়। নৃসিংহবাবু তাদের অভ্যর্থনায় অভ্যস্ত। পরিচয় প্রসঙ্গ শেষ হ'তেই দত্ত উল্লেখ করতে ভুললেন না যে, অশোক

নারীর প্রশ্ন

একটা পাশ করলেই এই মামাবাবু তাকে একটা দারোগার পদ পাইয়ে দেবেন পুলিশে।

সাহেব মামার অনুকরণে কোট-প্যাণ্ট পরেই তিতুদের বাড়ী এসেছিল অশোক, পিতার সঙ্গে। —কাছারীতে ব'সে ওদের কথা-বার্ত্তা চলতেই সে সোজা চলে গেল অন্দরে, তিতুকে সংবাদ জানাতে,—

—"মামাবাবু দারোগা, বেড়াতে এসেছেন রায় বাড়ী, মস্ত বড় তার ঘোড়া, কালো রং; —হিন্দুস্থানী চাকর ধ'রে রাখতে পারে না, দাঁত বের ক'রে কামড়াতে আসে। —রায় বাড়ীর ঘোড়াটাকে তো দীনুদাই টেনে নেয়। —মোটর সাইকেলও আছে, নিয়ে আসেন নি। —আমিও একখানা মোটর কিনবো দারোগা হ'য়ে"।

ছোট ভাইটিকে কোলে ক'রে সেখানে দাঁড়িয়েছিল পাশের গরীব ঘরের মেয়ে রিণি। তিতুর সঙ্গে সেও আসে খেলতে। —অশোকের কথা শেষ না হ'তেই প্রশ্ন জানায় সে,—

—"কোথায় রয়েছে সে ঘোড়াটা ?" ইচ্ছা ঘোরাটিকে একবার দেখে।

ভারি রাগ হচ্ছিল অশোকের এই মেয়েটার অনধিকার প্রশ্নে।—সে তো আর তার সঙ্গে কথা কইছে না!— তিতুকে কথা কইবার অবসরই যে দিচ্ছে না মেয়েটা।—

কটমটিয়ে রিণির পানে চেয়ে অস্বাভাবিক উত্তেজনায় জবাব দেয় অশোক,

—"গাছে"—

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে ভ্রূকুঞ্চিত করে রিণি। বলে,

—"গাছে; খায় কি তবে?"—

নারীর প্রশ্ন

আবার সেই অনধিকার প্রশ্নের দুঃসাহস! এবার রেগে উত্তর দেয় অশোক,

—"খায় মানুষ।"—

রিণি কিন্তু মোটেই ভয় না পেয়ে একটা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে, ঠোঁট দুখানি ঈষৎ বাঁকিয়ে ব্যঙ্গস্বরে বলে,—

—"মানুষ"? তারপরেই কোলের ভাইটিকে সামে অশোকের পানে একটু ঝাকিয়ে জানায়,

—"কই খাক্ দেখি,—ঘোড়ায় আবার মানুষ খায়!"—বলেই চ'লে যায় অবজ্ঞার ভঙ্গীতে।

অবমানিত আক্রোশে তেড়ে ওঠে অশোক, "ধর্"! পাশে শুয়েছিল ভোলা, অর্থ না বুঝে অনর্থ ঘটাতে তেড়ে গেল রিণির দিকে আক্রমনের সুরে।

রিণি ফিরে দাঁড়ায় রুখে।—ভোলা তার পরিচিত, তাকে শাসিয়ে বলে রিণি, —"কামড়াবি, কামড়ানা?"—

ভোলা তার ভুল বুঝে রিণির মুখের পানে চেয়ে লেজ নাড়ে কৈফিয়তের সুরে। তাকে তেম্নি শাসিয়ে চ'লে যায় রিণি, "—আবার যাবি তো আমাদের বাড়ী, তখন দেখবি আমরাও কেমন কামড়িয়ে দেবো বাঘাকে দিয়ে"।—

কথাটা বিশেষ কিছু গ্রাহ্য ব'লে বোধ হয় মেনে নিল না ভোলা, তাই সে নির্ব্বিকার ফিরে এসে যথাস্থানে সটান শুয়ে পড়লো তেম্নি। তিতু অস্বস্তি বোধ করে রিণির প্রতি এরূপ ব্যবহারে।

(*)

নারীর প্রশ্ন

ছয়

তিতু এখন বেশ বড় হয়েছে, লেখা-পড়া শিখেছে, খাতা কাগজে নাম লেখে "তৃপ্তি লতা"

সুমিত্রাদের চার বোনেরই বিয়ে হয়ে গেছে, চার বোনের আদর যত্ন একা পেয়ে বসেছে তিতু। ওযে অলক্ষুণে কেউ আর সে কথা মনেও আনে না এখন।

সুমিত্রার নাম কেন যে সুমিত্রা রাখা হয়েছিল তার কোন ঐতিহাসিক কারণ জানা নেই। সুমিত্রার ছোট বোনটির নামকরণ হয়েছিল, 'আন্না'। দুটি মেয়েই যথেষ্ট আর না,—এই অর্থে। আন্না বড় হয়ে 'আন্নু', অবশেষে অনিমা হয়েছে।

তৃতীয়টি 'বিরক্ত', গ্রাম্য' মনের অসহিষ্ণুতার পরিচয়। পর পর তিনটি মেয়ে; বিরক্তিটা আশ্চর্য্য কিছুই নয়! পরে সে হয়েছে বীরুবালা।

চতুর্থী 'ক্ষ্যান্ত';—অর্থাৎ এইপর্য্যন্তই শেষ। কিন্তু তা ব'লে তো আর বিধাতা পুরুষ শুনচেন না। 'ক্ষ্যান্ত' 'ক্ষেন্থ' হ'য়ে ক্ষনপ্রভায় দাঁড়িয়েছে এখন।

'পঞ্চকন্যা' পূর্ণ হ'ল, আর সেই এল সব চাইতে অবজ্ঞা, অভিশাপ, বিষাদ মাথায় ক'রে রূপের ডালি নিয়ে। তার শৈশবের সে সরল সৌন্দর্য্য এখন সলাজ চঞ্চলতা লাভ ক'রে উচ্ছলিত হ'য়ে পড়েছে প্রকৃতিদত্ত গোপন প্রসাধন সম্ভারে।

প্রকৃতির উপর আবার মানুষের রংতুলিকা বুলিয়ে তিতু যখন সাজে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সবাই চেয়ে থাকে 'শিল্পীত্রয়ের' সম্মিলিত শিল্প

বৈভবে সজ্জিতা এই জীবন্ত ছবির দিকে ;———‘ভগবান, প্রকৃতি আর মানুষ’।

তিতু লেখা-পড়ায় বেশ ভাল, কিন্তু, তাই ব লে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ও যে এমন একটা কৃতিত্ব দেখাবে তা কেউ আশা করেনি। তিতু বৃত্তি পেয়েছে কুড়ি টাকা! আনন্দে মায়ের বুক ফুলে ওঠে। জ্যাঠা মশাইর আনন্দ আর ধ’রে না; তিতুকে কাছে ডেকে গায়ে মাথায় হাতবুলিয়ে বলেন, “মেয়ে না হ’য়ে যদি ছেলে হয়ে জন্মাতিস তুই তা হলে যে আমার এ আনন্দ আজ আরও শতগুণ বেড়ে উঠতো?

তিতুর প্রাণে লাগে আবার সেই ছেলে না হয়ে জন্মানোর অপরাধ। সে বুঝতেই পারে না মেয়েদের জন্মটা কেন মোটেই কাম্য নয়, কী তাদের অপরাধ।

রায় বাড়ীতে ৺শ্রীশ্রীমঙ্গল চণ্ডী পূজা শেষে অঞ্জলি প্রদানান্তে তিতু প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে প্রনাম করে—এক জোড়া গরদের ধুতি দিয়ে।

সোহাগ ভ’রে বলেন শিক্ষক মহাশয়, “ও যে সাক্ষাৎ সরস্বতী, - রূপে, বিদ্যায়। ও কুমারীই থাকবে বিদ্যাদায়িনী মায়ের মতই। আজ ওর জন্যই আমার গৌরব, বিদ্যালয়ের প্রশংসা। ছেলেদের হার মানিয়ে দিয়েছে তিতু। ওকে বিয়ে দিয়ে এখনই মাটি করে দেওয়া চলবে না রায় মশাই।” মাথাটি নীচু করে তিতু এই আত্মপ্রশংসায়।

*　*　*

নারীর প্রশ্ন

বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় তিতুর নাম ছেপে বেড়িয়েছে 'তৃপ্তি লতা'। ভারি মিষ্টি নামটি, পূর্ণ তৃপ্তিরই বটে! কত রূপ দিয়ে অপরূপ ভঙ্গীতে সাজিয়ে নানা রংএ সে নিজেও তার নামটি লেখে 'তৃপ্তিলতা'।

একদিন যখন জানতে পেল, কেন তার নাম তিতা রাখা হয়েছে, আর সেই 'তিতা' রং ফলিয়ে আজ তৃপ্তিলতা রূপ গ্রহণ করেছে,- ঘৃনায়, লজ্জায়, অভিমানে, ক্ষোভে মাথা হেট হয়ে গেল,— ইচ্ছা হতে লাগলো; ঐ 'তৃপ্তি লতার' টুটি টিপে শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলে তক্ষুনি।

সত্য সত্য করলেও তাই। চোখের সামনে যতগুলি নাম লেখা ছিল, কতগুলি বা টেনে ছিড়ে, আর কোনটাকে বা কালির আঁচড় মেরে মেরে কেটে ফেল্লে।- কিন্তু, শুধু শুধু ঐ বাইরের নামটা কেটে আর কি হবে! এই দেহটা, জীবনটাই যে ওই নামটার প্রতীক,- পরিচয়। এই অবজ্ঞাত, অভিশপ্ত জন্মটাকে স্মরণ করিয়ে দিতেই যে ওই নামটার আবিষ্কার।

তিতুর মনে হইতে লাগিল, কত তিক্ত তাহার জন্ম; কত তিক্ততা বহন করে এনেছে সকলের প্রাণে সে! তাই তার কপালে এই কলঙ্ক টিকা একে দেওয়া হয়েছে আমরণ পরিচয় করিয়ে দিতে। আর এই নামটাকেই কিনা সে লিখে লিখে গর্ব্ব বোধ করেছে 'ইসপস্ ফেবলস্' এর দুষ্টু কুকুরের গলায় ঝুলানো ঘন্টার মতই। ইস্, কী আনন্দটাই না অনুভব করেছে এই নামটা লিখে লিখে!

নামগুলি কেটে, ছিড়ে গম্ভীর হয়ে বসে ভাবছে; সম্মুখে তার বড় 'টেবিল' আয়নাখানি,- চোখ পড়তেই চমকে ওঠে তিতু।

তৃপ্তি লতার সঙ্গে এরূপের ডালিকেও শেষ করে দিতে হয় যে। শুধু নামটা কেটে কি আর এর পরিচয় শেষ হবে! তবে!

বিদ্বেষ জেগে ওঠে ঠাকুরমার উপরে; কিন্তু পরক্ষনেই মনে পড়ে তার,— ঠাকুরমাও ভুক্তভোগী নারী। এটা তার নিজের মনের বিতৃষ্ণা নয়, সমাজ জগতের সমগ্র নারীজাতির আপন মনের আত্ম নিগ্রহ।

"অথবা অন্যেরই বা দোষ কি,- আমি নিজেই যে মন্দ ভাগ্য। নইলে বাপ খেয়ে কি আর কেউ জন্মায়! এম্নি শত সহস্র বিতৃষ্ণ চিন্তার পরে সে স্থির করলে, তার নাম সে আর তৃপ্তিলতা লিখবে না,— লিখবে 'অশ্রুকণা'।

একখানা বই টেনে 'তৃপ্তি' নামটাকে কেটে তারই পাশে লিখলে 'অশ্রুকণা'। প্রাণ তার কেঁদে ওঠে; একটা বিষাদের নিশ্বাস বেরিয়ে আসে তিতুর অন্তর থেকে। কিন্তু এইটেই যে তার যথার্থ পরিচয়। অশ্রুকণা তার প্রিয় সঙ্গিনী; বান্ধবী। 'তৃপ্তি তার কেউ নয়; তৃপ্তি বিশ্বাস হন্ত্রী, ছদ্মবেশিনী মমতা, অশ্রুকণা মায়াপাশ ছিন্না আত্মরূপ। আরও কয়েকটা নাম কাটতে গিয়ে একটা যেন প্রচ্ছন্ন বেদনা বোধ করে তিতু, যেন কত যুগের বন্ধুর বুকে ছুরিকাঘাত করছে সে।

সেদিন থেকে প্রয়োজন মত সমস্ত জায়গায়ই লিখে যায় অশ্রুকণা নামটাই;— এম্নি ক'রে লিখিত নাম তার প্রকাশ পেল 'অশ্রুকণা রায়'. গৃহে তিতুই তার পরিচয়।

এখন আর সে কোন ক্ষোভ বোধ করে না এতে। এ ছুটিই যে তার নগ্ন সত্য রূপ। কোন ছদ্মবেশ নাই, কোন ছলনা নাই

আত্মগোপনের! 'তৃপ্তি' কে আর কোন রূপেই গ্রহণ করা চলে না আত্ম প্রবঞ্চনা ক'রে।

মা কিন্তু টের পেলেন সকলের আগে, তার এই নাম গ্রহণের মর্ম্ম, কিন্তু কোনরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি কখন ও।

(*)

● ● ●

সাত

শ্রীশ্রী৺মঙ্গলচণ্ডী পূজা আঙ্গিনায় আলোচিত মুখ্য বিষয়টি সবিস্তার বর্ণনা পূর্ব্বক মদন দত্ত গৃহিনীকে মন্তব্য জানাইলেন,

"বিয়ে তো আর এখন হচ্ছে না, বাড়ী থেকেই কলেজ করবে তিতু। অশোক ও রোজ যায়, দু'জন একসঙ্গেই যাবে আসবে। তার পর, ওরা একটি ভাল ছেলের সন্ধানে আছেন ঘর-জামাতার মতলবে। কিন্তু আমাদের অশোক সম্বন্ধে তো ওরা আর সেরূপ কোন কল্পনা করতে পারেন না, যদি না আমরা একটা কিছু আভাষ দেই। কেননা, ওরা জানেন, আমাদের 'ওই এক কানাই'!

—আমরা নিশ্চয়ই রাজী হব না সে প্রস্তাবে। অশোককে ওরা স্নেহ করেন, বরং উল্লাসিতই হবেন তাতে।”

একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিতে সুরু করিলেন,—“তা, ছেলে পর হ'য়ে যাবার ভয়; সেই বা আর কোথায়? বিয়ে হয়ে ওই রায় বাড়ীতেই তো থাকবে। নৃসিংহ রায় যে কটা দিন বেঁচে আছেন, তার পর আমরাই তো সব। দারোগা হ'য়ে অশোক তো আর বাড়ী ব'সে থাকতে পারবে না—তখন বিষয়-সম্পত্তি আমরাই দেখা শুনা করবো ওখানে ব'সে। আর ভাঙ্গন একবার লাগলে বেশী দেরী সয় না, এক ভাই আর ভাইকে ডাকাডাকি করেই যায়।”

এবম্বিধ বিচারান্তে গৃহিনীকে পরামর্শ দিয়া দিলেন একবার ছোট রায় বৌমার সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনার সূত্রপাতার্থে। তারপর কুটুম সাহেব আর একটিবার এদিকে আসিলেই যে রায় মহাশয় হাতে আসিবেন, ইহা তাহার ধ্রুব সিদ্ধান্ত।

* * *

তিতু কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে;—বাড়ী হইতে শহরে যাতায়াত করে ‘রিকস’ করিয়া, সদর রাস্তায়। পথে তাহাদেরই কত প্রজা সেলাম জানায় দিদিমণিকে,—পথ ছাড়িয়া দেয় সসম্ভ্রমে। কেহ বা প্রশংসা করে ওর রূপের, কেহ বিদ্যার, আর কেহ বা পিতা প্রেমেন রায়ের। আনন্দে নাচিয়া ওঠে তিতুর বুক,—অহঙ্কারে নয়।

নারীর প্রশ্ন

পুরা দু'টি মাসও কাটে নাই তিতু ভাত্ত হয়েছে, আর তখনই একদিন অপ্রত্যাশিত রূপে পরলোক গমন করলেন—যার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে 'বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়',- সেই বড়বাবু নৃসিংহ রায়।

ভাঙ্গন যে এবার পরিপূর্ণ হ'ল সে কথা একবাক্যে সকলেই স্বীকার কর'ল। এবং উহা যে ঐ লক্ষ্মিছাড়া মেয়েটার ভাগ্য দোষেই তাহাও আর মেয়ে মহলে বুঝতে বাকী রইল না। অনেকেই বলাবলি করতে লাগ'ল,—"চার চারটে মেয়েকে জ্যাঠামশাই ভাল ঘর-বর দেখে বিয়ে দিলেন, —আর ওই ডাইনী,—ওকেই কিনা তিনি সব চাইতে বেশী ভালবাসতেন ; —পণ্ডিতটি ক'রে বিয়ে দিবেন ব'লে গাড়ী ক'রে পাঠান শহরে। - আবাগী, খাবি তো তাকেই খেয়ে বসলি!—ও যার ভালবাসা পাবে তাকেই খাবে।"

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি অপ্রত্যাশিত কাণ্ড সংঘটিত হ'ল ;—গ্রামের সেই প্রবীন শিক্ষক মহাশয় যিনি তিতুর শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন সপ্তাহ কাল মধ্যে একই কলেরা রোগে রায় মহাশয়ের অনুগমন করলেন। তিতুর প্রানে দারুণ আঘাত লাগ'ল।

বাস্তব যে কল্পনাকে এড়িয়ে চলে, একথা সত্য প্রত্যক্ষ হ'ল এই রায় বংশের পঞ্চমা কন্যাটির অদৃষ্ট বিচারে।

বৃদ্ধা ঠাকুরমার কি সে মর্ম্মস্পর্শী করুণ আর্ত্তনাদ। জ্যাঠাইমার বৈধব্য, পিতৃতুল্য জ্যাঠাইমনির মৃত্যু, পিতৃস্থানীয়—শুভাকাঙ্খী শিক্ষক মহাশয়ের তিরোধাণ, —নিজেদের এই অসহায় অবস্থা, — সমস্ত মিলে তিতুকে অতিষ্ঠ করে তোলে। পিতাকে সে চিনে না,

কবে তার মৃত্যু হয়েছে তাহাও জানে না। পিতৃবিয়োগ ব্যথা ছিল তার কল্পনার বস্তু মাত্র। আজ জ্যাঠামশাইর মৃত্যুতে সে সত্য পিতৃশোক উপলব্ধি কর'ল।

গ্রামের কতগুলি মেয়ে যে কুমন্তব্য করে তার সম্বন্ধে— কানে আসে; কিন্তু, কোনই দুঃখ অনুভব করে না তিতু তাহাতে। বোঝে —সত্যই সে বড় অলক্ষ্মুনে; নইলে পর পর এমনি সব অনাছিষ্টি কাণ্ডগুলি ঘ'টে চলেছে কেন। বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে তার মন,— একবার ভাবে,— "নাঃ কাজ নেই আর লেখা পড়ায়, —এই পাপ জীবনটার জন্য আর এত কেন!"

অদৃষ্ট বিচার করতে বসে তিতু,—"মানুষের জন্মের জন্য দায়ী কে? ভগবান ব'লে যদি কেউ থাকেন নিশ্চয়ই তিনি, মানুষ তো নয়! জন্মমৃত্যু মানুষের করায়ত্ব হ'লে সে নিশ্চয়ই এরূপ অদৃষ্টদোষ ভাগী হ'ত না। একের মৃত্যুর জন্য আর একজন দায়ী হ'তে যাবে কেন! মানুষ কি আর অমর হয়ে জন্মায়! যে সংসারে নব শিশু জন্মায়নি, সেখানে কি আর লোক মরছে না? এই রায় পরিবারের এরাও কি মরতো না? তবে আমার উপরে এই অবিচার কেন? —এই রায় সংসারটাই বা আর কতটুকু;— শুধু এর গণ্ডীর সঙ্গেই কি আমার যাবতীয় অদৃষ্ট সম্বন্ধ? আমি তো বিরাট বিশ্বসংসারের জীব, বিশ্ব সংসারের সঙ্গেই কি আমার অদৃষ্ট সম্বন্ধ নয়? তাই যদি,— তবে বিশ্বের বিশাল জন্ম-মৃত্যুর জন্যও কি আমিই অপরাধিনী? এই সংসারখানির গণ্ডী কি, যা দিয়ে আমায় বিশ্বসংসার থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে; এই

ক্ষুদ্র সংসারের মায়া?" -সে আর ভাবিতে পারে না,—সমস্ত মায়া বন্ধন এইখানেই শেষ হতে চায় যে।

আবার বিচার করে সে,—"ছেলে জন্মালে আনন্দের সীমা নাই, আর মেয়ে? কি দারুণ বৈষম্য! এটাও কি ভগবানের বিচার! মেয়ে-জন্ম যদি এতই অবাঞ্ছিত, বিশ্বের কল্যাণে কি বিশ্বস্রষ্টা সে নারী জন্মটা রোধ করে দিতে পারেন না একেবারে।

—'ছেলের হাতে জল পিণ্ড গ্রহণ করেন পিতৃপুরুষ, ছেলে হ'তে বংশ রক্ষা হয়,—কার এ নির্দ্দেশ, - ভগবানের?

একই রক্তমাংসে ছেলে ও মেয়ের জন্ম—ছেলে আর মেয়ের সম্মিলিত শক্তিতেই ভবিষ্যৎ বংশের উদ্ভব,... তবে কেন শুধু ছেলের জল পিণ্ডই গ্রহণ করবেন পিতৃলোক? কে বল্লে এ সত্য! শাস্ত্র? সে শাস্ত্র যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ কি? ঐ শাস্ত্র ও যে লেখা ঐ ছেলেদের; - মেয়েরা লিখলে বোধ হয় অন্যরূপ দাঁড়াত।"

আবার তার সেই সঙ্গে মনে পড়ে 'ইসপস্ ফেবলস্' এর কথা; —' If we lions kenw how to erect statues, you could see the man under the paw of the lion"—আমরা সিংহেরা যদি মূর্ত্তি গড়াতাম (গড়াতে জানতাম), তাহলে ঐ সিংহের পায়ের তলায়ই মানুষকে দেখতে পেতে।

তাই তো শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের —অধিকার নেই; তারা যদি অবিচার বিশ্লেষণ ক'রে সত্যকে জানতে পায়, গোল বাধায়!

নারীর প্রশ্ন

দৈহিক কিংবা মানসিক শক্তির দিক থেকেই কি মেয়েরা খাটো, ছেলেদের চাইতে তারা হীন? কর্ণদেবী, চাঁদবিবি, ঝানসীর রাণী, সুলতানা রিজিয়া, লীলাবতী, খনা, মহারণী ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি মহীয়সী নারী,—এমন কি এযুগের বাঙ্গালী গৃহে মহীয়সী সরোজিনী নাইডু পর্য্যন্ত। আরও কত শত নারী, কি যুদ্ধবিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কিম্বা যে কোন দক্ষতার পরীক্ষায় পুরুষের চাইতে কম কৃতিত্বের পরিচয় নিশ্চয়ই দিতে পারতো না, শুধু সে সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিতা ক'রে রাখা হয়েছে ব'লেই নয় কি?''

সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে তার নিজের কৃতিত্বের কথাটা; তুলনা ওঠে মনে অশোক আর পাশের ছেলেদের সঙ্গে। একটুখানি গর্ব্ব বোধ হতেই লজ্জা দেখা দেয় মনের কোনে,—"দূর ছাই, এ আবার কি! দেখাতে হবে পুরুষদের যে নারীর শক্তি কত!''

তার আরও মনে হ'ল,—"উচ্চ হিন্দু-ঘরে মেয়েদের এত অপমান কেন! বিবাহ? সে কি শুধু মেয়েদেরই প্রয়োজন;—তার বিবাহ না হলেই অপবাদ, আর পুরুষদের কোন বালাই নেই। আমি না হয় বাপ খেয়ে জন্মেছি, রাক্ষুসী। তিক্ততার বিষ বইয়ে এনেছি,—তাই পরিচয় কলঙ্ক কপালে এটে ছুটে চলেছি দুর্ভাগ্যের পথে। কিন্তু, ওই আর বোনেরা;—তারা তো আর রাক্ষুসী নয়, অলক্ষুণে নয়। তবে কেন তাদের ঐ সব নাম? তাদের জন্মটাও যে কাম্য নয়, ঘৃন্য,—সে কি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে কিছু ঐ

নামগুলি থেকে? বিয়ের চিন্তাই কি এর একমাত্র কারণ? এত অবজ্ঞা নারীর।"

—শিশু কাল হতে যে বিবাহ কল্পনা তার প্রাণে দুশ্চিন্তার রেখা পাত করেছিল, আজ প্রকাশ্য বিদ্রোহ লয়ে সে সাড়া দিয়ে উঠ'ল। তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করে বস'ল তিতু,—"বিয়ে করবো না।" আর সেইদিন হতে ছেলেদের দেখলে কেমন একটা ঈর্ষা, বিতৃষ্ণার ভাব জেগে ওঠে তার মনের কোনায়। কোন ছেলের প্রতি সহৃদয় দৃষ্টি ল'য়ে তাকাতে পারে না সে।——হৃদয়ে জেগে উঠ'ল বিদ্রোহের ঝড়; এবং তারই শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ছেলেকে প্রেমের দৃষ্টিতে, ভালবাসার চোখে গ্রহণ ক'রতে পারে নাই সে। বিদ্রোহের ঝঞ্ঝায় প্রেম ভালবাসা অনেকদিন পর্য্যন্ত তার হৃদয়ে নীড় গড়তে পারে নাই।

(*)

আট

দাদার মৃত্যুতে গৌরিশঙ্করকে সংসারে ফিরে আসতে হ'ল। বৃদ্ধা মাতার শোকাতুর হৃদয়ে একমাত্র সান্ত্বনা সে ছাড়া বর্ত্তমানে আর কেহই নাই। বিবাহ যোগ্যা কন্যা তিতু; বৌদিরা স্ত্রীলোক;—সংসার পরিচালনার উপযুক্ত লোকও কেহ নাই। সংসার দেখা-শুনা করিবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাহারও খুব স্বল্পই আছে; আকর্ষণও। সংসারের উন্নতি অবনতির চিন্তা গৌরিশঙ্করকে বিশেষ কিছু টানে নাই,—টেনেছে বৃদ্ধা মা, আর তিতু। শেষ পর্য্যন্ত তাই তিনি গৃহে আশ্রয় না নিয়ে আর পারলেন না।

দাদার মৃত্যুতে গৃহে ফিরে যখন প্রধান শিক্ষকের মৃত্যুও তাকে দেখতে হ'ল এবং নূতন শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্ন দেখা দিল,—গৌরিশঙ্কর স্থির করলেন অমলকৃষ্ণকে এনে উক্ত পদে নিযুক্ত করবেন।

অমলকৃষ্ণ চৌধুরী বুনিয়াদি ভদ্র সন্তান; পিতা তাহার বড়লোক ধনী। শৈশবে মাতৃহারা অমল ঈশ্বরানুরাগী, পিতার অশেষ যত্ন সত্বেও সে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে চলিয়া আসে, এবং তাকে ফিরিয়ে নেবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই পিতার ব্যর্থ হয়।

এই আশ্রমে থেকেই সে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে, এবং আশ্রম সূত্রেই গৌরিশঙ্করের সঙ্গে পরিচয়। অমলের সম্যক পরিচয় পরিজ্ঞাত থেকেও গৌরিশঙ্কর উহা প্রচার করে বেড়াতে প্রয়াসী নন। অমলের প্রতি গৌরিশঙ্করের স্নেহাকর্ষণ অত্যধিক; অমলকৃষ্ণও গৌরিশঙ্করকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করেন।

নারীর প্রশ্ন

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পূর্ব্বাপরই বিশেষ কোন মনোভাব পোষণ করে না অমল, অথবা এক প্রকার উদাসীনই সে। মাতৃজাতি রূপে অতিরিক্ত সম্মান, কিম্বা নারী হিসাবে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ অথবা সাগ্রহ কামনা,—কোনটাই তাহার নাই। কোন মেয়ের অপরূপ রূপ-লাবণ্যেও যেমন মুগ্ধ হয় না অমল, তেমি যে কোন কারনেও সে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ও দেখে না কোন মেয়েকে। সে জানে স্ত্রীলোকও মানুষ। স্ত্রী-পুরুষ ভেদ বিচার নিয়ে এ পর্য্যন্ত মাথা ঘামায় নাই কোনদিন। প্রয়োজনও বোধ করে না।

অমল স্বভাবতঃই কোন কিছুতে হৈ হৈ করে মেতে ওঠে না। সে বলে

"ওই-রূপ মেতে ওঠা একটা উন্মাদনা মাত্র। নিজেকে বশে না রাখার অবস্থান্তর বিশেষ। ধর্ম্মোন্মাদ, জ্ঞানোন্মাদ, অর্থোন্মাদ, প্রেমোন্মাদ, কামোন্মাদ কিম্বা উন্মাদ বদ্ধ পাগল, এ সবার পিছনে ঐ আত্মহারা অবস্থার পরিচয়। চিন্তার পথে এমন একটা ভাব বিশেষে এসে পৌঁছায়, যখন আর নিজেকে বশে রাখতে পারে না। আর সেই দুর্ব্বল অবস্থায় ধর্ম্মোন্মাদকে আমরা পূজা করি মহর্ষি বশিষ্টের চাইতেও ;—জ্ঞানোন্মাদকে শ্রদ্ধা করি রাজর্ষি জনক অপেক্ষাও। অর্থোন্মাদকে দেই বাহাদুরী, কমোন্মাদকে করি ঘৃণা, আর বদ্ধ পাগলকে উপেক্ষার পর্য্যায়ে ফেলি। কারণ, ধর্ম্মকে চিরদিনই মানুষ পূজা করে এসেছে ; জ্ঞানকে করেছে শ্রদ্ধা, অর্থের করেছে স্পৃহা, কামকে করেছে ঘৃণা, আর বাতুলের অর্থহীন প্রলাপকে করেছে উপেক্ষা। আত্মহারার চরম দুর্ব্বলতাই বাতুলতার লক্ষণ।"

তাই উন্মাদনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বাবস্থায় সাম্য রেখে চলার ভিতরে অনেকেই তার স্থবিরত্ব দেখতে পান।

এই অমলকৃষ্ণ চৌধুরী শেষ পর্য্যন্ত রায় বাড়ীর একজন অতিথি রূপে উপস্থিত হলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ ক'রে।

নূতন সংসারে এসে কোনই সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই, -- যেন কত যুগের আত্মীয়তা! গৌরিশঙ্করকে অমল কাকা বলে ডাকেন সেই আশ্রমে একত্র থাকা কালাবধিই; আর সেই সূত্রেই সকলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে।

বৃদ্ধা মাতা, নৃসিংহ আর প্রেমেন—দুই পুত্রের মৃত্যু দিয়ে যেন দুই পুত্র ফিরিয়ে পেলেন, গৌরিশঙ্কর আর অমল।

আশ্চর্য্য মানুষের মন; শত ঘাত-প্রতিঘাতেও সুখ কল্পনার শেষ সূত্রটাকে পরিত্যাগ করতে পারে না সে।

এই শেষ বয়সে, সংসারের এত বিচিত্র মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা সত্বেও বৃদ্ধা আবার নূতন করে আশার জাল বুনিয়ে চললেন। "গৌরি যদি বিয়ে করে! আহা! কী তার এমন বয়েস, ওর চাইতে ঢের বয়সে মানুষ দার পরিগ্রহ করে, বিশেষতঃ বংশ রক্ষার্থে। পূর্ব্ব পুরুষের উদ্ধার সাধনই পরম ধর্ম্ম, তা নইলে ওই সন্ন্যাস মহা-পাতকেরই কারণ মাত্র। পিতৃপুরুষ অভিশাপ বর্ষন করবেন ওর শিরে পিতৃলোক হতে।' —গ্রামের প্রাচীন প্রাচীনা অনেকেই বৃদ্ধার সমর্থণ জানালেন।

দ্বিতীয় কল্পনা,—"অমলের সঙ্গে তিতুর বিয়ে দিয়ে অমলকে ছেলের মত ক'রে গৃহে রাখা! আহা, এমন দিব্যি ছেলে,—সে

কিনা মাতৃহীন বলেই এই কচি বয়সে বিরাগী হ'য়ে দিন কাটাবে! সংসারে মা থাকলে কি আর এমন হয়। —তিতুর রূপের সঙ্গে দিব্যি মানবে বলেই না ভগবান অমলকে এনে দিয়েছেন।" একথা তিনি বৌদের সঙ্গেও আলোচনা করলেন; বড়ই সুখের হবে এ সংসার।

(*)

নয়

মায়ের সঙ্গে ঠাকুরমার আলোচনা প্রসঙ্গ তিতুরও অজ্ঞাত রহিল না। —"ছিঃ, নিজ পিতৃপিতামহোপার্জ্জিত ধনসম্পদ সমস্ত ডালি দিয়ে আনতে হবে একজনকে, আর তারই পরিচয়ে পরিচয় দিবে এই বিরাট ধনৈশ্বর্য্য। তারই পরিচয় তলে তলিয়ে যাবে রায় বাড়ীর বংশ গৌরব যথা সর্ব্বস্ব মূল্য দিয়েও! তার চাইতে লুপ্তই যদি হয় তবে ডুবে যাক্ যেম্নি আছে তেম্নি এই বংশের ভবিষ্যৎ, তবু অপরের বংশপরিচয়ের অবমাননা হ'তে।" মনে তার তীব্র বিতৃষ্ণা সমগ্র পুরুষ জাতটার উপর। অমলকেও সে সরল চোখে দেখতে পারে না তাই।

অমল আশ্রম বাসী; -আশ্রম জীবনের ঘোর অন্তরায় নারী,— শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। সুতরাং, আশ্রম বাসী জীব যে নারীকে ঘৃণা করে

নারীর প্রশ্ন

ইহা স্বতঃসিদ্ধ। প্রমাণও তার রয়েছে বিস্তর। নারীর হাত হতে ভিক্ষা গ্রহণের অপরাধে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বর্জ্জন করেছিলেন তার প্রিয় শিষ্যকে। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাধক যুগাবতার পরমহংসদেব তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার অপরাধে এক নারীকে বলেছিলেন একদিন. "পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে নেই তোদের, দূর থেকে প্রণাম করবি তোরা"। তারপরে গঙ্গাজলে বিধৌত করেছিলেন নারীস্পর্শদুষ্ট অপবিত্র সে পদশ্রী। নারী মহাপুরুষের পাদস্পর্শেরও অযোগ্যা,— বৈষ্ণব ভিখারীকে ভিক্ষাদানেরও অনুপযুক্তা.! কি নীচমনা এই পুরুষ, কী দুর্ব্বল এদের অন্তঃকরণ ; নারীর স্পর্শই ইহাদের অধঃপাতের কারণ !

তিতুর এই ধারণা, এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় করে তুলেছিল অমলের স্বাভাবিক নির্লিপ্ত ব্যবহার। তিতুর প্রাণে যে বিদ্রোহের অনল জ্বলে উঠেছিল অমলের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য তাচ্ছিল্যের অভিব্যক্তিতে শুধু ইন্ধনই জুগিয়ে চলে তা'তে। তাই দু'জনার মধ্যে একটা ব্যবধানই রয়ে গেল যখন বাড়ীর আর সকলের সাথে অতিমাত্রায় ঘনিষ্টতা স্থাপিত হ'ল।

গৌরশিঙ্করের মুখে অমলের প্রশংসা তিতুকে অতিষ্ট করে তোলে। "কি আছে ওই অমলের চরিত্রে; ত্যাগ, সংযম, সারল্য কোন নারীতে নাই কি ? আশ্রম আশ্রয় করেছে বলেই সংসারাশ্রিতা নারী তার এতই নীচে ?" তথাপি কখনও নিজের মনোভাব বাইরে ফুটে উঠে হেয় প্রতিপন্ন করে না তিতুকে। যে ব্রত গ্রহণ করেছে সে, নীরবে সাধনা করে চলে তাহারই,— নতি স্বীকার করিতে পারে না আদর্শ মানবের কাছে। সেও হবে আদর্শা নারী সংসারের ভিতরে থেকেই।

নারীর প্রশ্ন

উভয়ের মনোভাব ঘনিষ্টতার পরিপন্থী। একজন স্বভাবতঃই কাম্য পদার্থে স্পৃহাশূন্য, আর একজন অভিমানে বিদ্রোহে, অন্তরের প্রবৃত্তি শাসনে ব্রতচারিনী, কম্য-বস্তুতে উপেক্ষমানা।

যে ছেলের প্রশংসা যত বেশী বিদ্রোহী তিতুর আক্রোশ তার প্রতি তত অধিক। যাহারা মেয়েদের প্রতি উপেক্ষমান বিশেষতঃ, তাহারাই তিতুর ঈর্ষার পাত্র। বিদ্রোহী প্রাণ সর্ব্বদা বিদ্রোহ খুঁজেই তৃপ্ত, বিদ্রোহ প্রতিযোগীতায়ই আনন্দ।

অশোকের এসব কোন বালাই নাই, সে তিতুকে ভালবাসে অথবা পাইতে চায়:— বিশেষ ক রে, সে তার আপন পিতা-মাতার সহানুভূতিশীল অভিপ্রায়টি পরিজ্ঞাত হওয়া অবধি। তাই তিতুর মন জুগিয়ে কায়মনোবাক্যে সবকিছুর সমর্থণ এবং সম্পাদনা করে চলে মৎস্যরাজকন্যা-রূপ-মুগ্ধ রাজা শান্তনুর মতই। প্রাত্যহিক পারিপার্শিক শৈশবের সাথীজ্ঞান ছাড়া অশোকের প্রতি অন্য কোনরূপ ভালমন্দের আকর্ষন নাই তিতুর।— সে অবজ্ঞাও করে না তাহাকে।

চিন্তার গতি যেথায় ভিন্নমুখী, আদর্শ যাহাদের বিভিন্ন হৃদয়ের প্রকৃত মিলন সেথায় কথনই সম্ভব নয়।

এতদ্ব্যতীত নারী-চরিত্রের যে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট তাহাকে এড়িয়ে চলবার শক্তি তিতুরও নাই, যতই কেননা উদাসিনী হউক সে, যতই কেননা কঠোর হউক তার প্রতিজ্ঞা। নারী, বিশেষ করে সে যদি হয় অসামান্যা রূপের অধিকারীণী, স্বীয় রূপ-সজ্জার উপযুক্ত মূল্য যদি না লাভ করে উপযুক্ত পুরুষের কাছে, হতমান হ'য়ে ওঠে তার নারীত্বের গৌরব, প্রতিহিংসা পরায়ণা হয় তার আহত নারী-চেতনা। সে চায়,

তার রূপের ঝলকে বিশ্বকে তাক্ লাগিয়ে দিতে। কিন্তু, যে পুরুষ প্রবর মৌন ঋষিবৎ চক্ষুমুদে ব সে থাকেন উদাসীন হ'য়ে, প্রকাশ করেন না অন্তরের দুর্ব্বলতা, নারীর আহত আক্রোশ তাদেরই আক্রমণ করে ফিরে বৈরীতার শ্রেষ্ঠ-প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। তাই যুগে যুগে রূপ-শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশী অভিশাপ দিয়ে বেড়ায় ব্রহ্মচারী বনবাসী অর্জ্জুনকে। মেনকা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া ফিরেন জটাজুটধারী রাজ্যত্যাগী তপস্বী বিশ্বামিত্রের; সতী শিরোমণি রূপের আধার জগন্মাতা উমা যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ধন্যা বোধ করেন ব্যঘ্রচর্ম্মধারী, ভস্মভূষিত, আপন-ভোলা উদাসী শিবের পায়ের তলায়; মদনের নয়, মদনভস্মকারীর। আর যে পুরুষ আত্মহারা হয় নারীর সৌন্দর্য্য প্রলোভনে, নারী তাকে অবজ্ঞা না করলেও ভালবাসে, সাপুড়ে যেমন সাক্ষাৎ কালরূপী ফণীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে অঙ্গে জড়িয়ে খেলিয়ে আনন্দ পায়, বিজয়ের আত্মপ্রসাদে।

তিতুও মানুষ, এবং নারী। তার ভিতরেও নারীর সে নিজস্ব ধর্ম্মটুকু আছে বৈ কি! তাই অমল যেমন অর্জ্জুনের মতই উর্ব্বশীর অভিসম্পাতের, অশোক তেমনি শান্তনুর ন্যায় মৎস্যরাজকন্যার ঔদাসীন্যের বস্তু হইয়া বসিয়াছিল তিতুর চোখে।

প্রভুত্বের নিকটে, শত্রুর দরজায়, যে কাহারও কাছে মানুষ দাসবৎ আত্মবিসর্জ্জন দিয়ে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না, লাভ করে করুণা; ভালবাসা নয়। স্বীয় ব্যক্তিত্ব রক্ষাকারী করুণার দানমাত্র ভালবাসা লাভে বঞ্চিত হলেও, প্রতিদ্বন্দ্বীতার, বৈরীভাবের অন্তরালে আকর্ষণ করে অন্তরের শ্রদ্ধা; প্রভুর, বৈরীর, নারীরও। অন্তরের নিভৃতকোণে সেই শ্রদ্ধা জাগে বলেই বাইরে জেগে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বীতা। মুকুরে

প্রতিফলিত স্বীয় সৌন্দর্য্য দর্শনের মতই প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে স্বীয় যোগ্যতা পরিচয়-সুযোগে পুরিস্ফুট-হয়ে ওঠে স্বীয় আদর্শেরপ্রতি সেই অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা, অজ্ঞাতে প্রতিযোগী লাভ করে বন্ধুত্ব।

এই আদর্শ প্রতিদ্বন্দ্বীতার অস্তিত্বই বাইরে তিতুর মনে ফুটিয়ে তুলেছিল বৈরীতা, অজ্ঞাতে অন্তরের কোণায় শ্রদ্ধা যে নীড় বেঁধে চলেছিল তাহা সে টের পায় নাই।

—(*)—

দশ

কলেজে প্রবেশ ক'রবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে তিতুকে প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ ক'রল। সৌন্দর্য্য, বিদ্যা, বিনয়, এবং বিত্ত যেখানে একাধারে বিদ্যমান সমাদর সেখানে স্বাভাবিক।

সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ কারণটি হচ্ছে তিতুর চাল-চলন, সরল ব্যবহার আর মিষ্টি কথা সুরুচির পরিচয় দিয়ে স্বতঃই প্রাণকে আকর্ষন করে। নিজের বিদ্যা অথবা বিত্তাভিমান কোথাও এতটুকু প্রকাশ পায় না হাবভাবে। কটাক্ষে তার জ্বালা নাই, কিন্তু আত্মবোধ গরিমার পরিচয় দেয়; বাক্যে তার অহঙ্কার নাই, প্রকাশ করে অন্তরের আবেদন মিশ্রিত ভাবের উত্তেজনা। রূপের বিজলী দ্রষ্টাকে উশৃঙ্খল করে না, করে শান্ত প্রভাবে আকর্ষণ। তিতুকে পরিচালিকা ক'রে কলেজের নারী কল্যাণ বাহিণী সতেজ হয়ে গড়ে উঠ'ল।

নারীর প্রশ্ন

নারীর স্বাধীনতা, স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধান এই বাহিনীর লক্ষ্য। গ্রামে গ্রামে কলেজের গ্রামবাসিনী মেয়েদের আশ্রয় করে বাহিনীর সভ্যা এবং শাখা প্রশাখার বিস্তার লাভ ঘ'টে চল্‌ল। ছেলেরাও কেহ বা সুযোগমত সে বাহিনীতে যোগ দিল নারী কল্যাণার্থে, কি নারী-সঙ্গ লাভে স্বীয় অভিষ্ট কল্যাণে, চিন্তার বিষয় বটে! সকলের অবস্থা অবশ্যই তা নয়, তবে অধিকাংশ ছেলে যারা বাহিনীর বিশিষ্ট কর্ম্মী হয়ে দাঁড়াল ইপ্‌সিত কল্যাণে বঞ্চিত হ'ল না। পরিশেষে অনেক সভ্যা কন্যাদায়ের হাতে পিতামাতাকে মুক্তি দিতে পারলেন তাদের মতামতের বাইরেই।

পরিচালিকা অশ্রুকণা কিন্তু ছেলেদের সাহচর্য্যকে অবমাননার বিষয় বলে মনে করেন। নারী নিজের শক্তিতেই তার পথ করে নেবে, জলধারা ক্ষুদ্র এবং সংকীর্ণ হলেও যেমন করে আপন গতিপথ তৈরী করে লয়, কঠিন পর্ব্বত গাত্রে বিশাল শিলাখণ্ডের-বাঁধা বিপত্তিকে ভেঙ্গে। কিন্তু, তথাপি আপাতঃ বর্ত্তমান কোন কোন কারণে তিনি এরূপ সাহায্য উপেক্ষাও করতে পারলেন না, কারণ, অবস্থা এমনও দেখা গেল যে, ছেলেদের এইরূপ অযাচিত সহানুভূতি প্রত্যাখান করতে গেলে কতক সভ্যা আপনা হতে স্বেচ্ছায় বাহিনী পরিত্যাগ ক'রতে চাহেন পুরুষদের বাদ দেওয়ার সংকীর্ণতা দোষ দেখিয়ে। বিদ্রোহিনী-তিতু চায় ওইরূপ কর্ম্মিদের এড়িয়ে চলতে, এরূপ প্রতিষ্ঠানের পৌর-হিত্যার্থে রবাহুত যে অতিথি তাকে সে সম্মান দিতে পারে না, ঘৃণা করে।

কিন্তু, ওই অমলকৃষ্ণের ন্যায় যারা দূরে থেকে বিরোধীতাও করে না, কিম্বা এগিয়েও আসে না কোন প্রকার সহায়তাকল্পে, সাধারণ দৃষ্টিতে

সবকিছু দেখার ভঙ্গীতে চলে মাত্র, তাদের প্রতি তার তীব্র আক্রোশ। বাহিনীকে বিশেষ দৃষ্টিতে না দেখার, তাচ্ছিল্যের প্রতিবাদে মনে মনে দাবী করে তাদের সশ্রদ্ধ সমর্থন, কিন্তু, আমন্ত্রণ জানায় না সাহায্য প্রার্থনায়। বিদ্রোহ আন্দোলন প্রচেষ্টা ওই ধরণের লোকগুলির প্রাণে কোন প্রকার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে না পারায় ব্যর্থতার বেদনায় তীব্রতর হয় ক্ষুব্ধ অভিমান।

অশোক এই বাহিনীর একজন উদ্যোগী কর্ম্মী (রবাহূত!). সমাদর ও তার আছে বটে। রূপ এবং বিদ্যারও একান্ত অভাব নাই, কথা এবং বর্ক্তৃতা ক'রবার ভঙ্গী আছে, আরও আছে অতিশয় 'আপ-টু-ডেট্' সাজ-সজ্জা ও চালচলন।

বাহিনীর সকলেই জানেন, অশোক স্বয়ং পরিচালিকা অশ্রুকণার বাল্যবন্ধু, ভবিষ্যতের (অনুমিত ও প্রচারিত) ঘনিষ্ঠ প্রিয়তম আত্মীয়!

ছোট শহরের ছোট্ট সংবাদপত্রে এই বাহিনীর কার্য্যকলাপ বড় হরফে ছাপা হয়। সম্পাদকীয় অংশে বিশেষ বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ করে একদিকে বাহিনীকে যেমন পরিচয় করিয়ে দেন সকলের সঙ্গে, অপর দিকে সম্পাদক নিজেও সভ্য সভ্যাদের প্রীতি-পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন তেমনি।

শহরখানির বৃহৎ চা এর দোকানের টেবিলে 'চা'-চাটনির-চাটাচাটি, মতানৈক্যের চটাচটি আর কাগজের বুকে চপেটাঘাতে গরম চা এর দোকান আরও সরগরম হয়ে ওঠে - সেই সম্পাদকীয় অংশ পাঠে।

একজন বলেন,— "মিস্ সেন যে বিয়ে করেননি, সেতো শুধু এই নারী-বাহিনীর জীবনদান কল্লেই। বিয়ে ক'রে ডজন খানেক শিশুর

শুশ্রূষা করতে কখন ফুরসৎ পেতেন এই শিশু-বাহিনীকে গ'ড়ে তুলবার ! ওদের কফ, ঝাড়তেই হাতের জল শুকোতো না যে ।"

আর একজন বলেন, ' সত্যই ভাই, আমাদের দেশের মেয়েগুলো বিয়ে ক'রে শুধু রান্নাঘরেই জীবনটা মাটি করে দিলে। তোফা কাজ দেখাতে পারে যদি এরা বেরিয়ে পড়তে পারে স্বাধীনভাবে ।"

ভাবের সঙ্গে বা'হাতের তেলোতে ডান হাতের ছোট্ট একটি চাটি মেরে বলেন অপর একজন, "মাইরি বলছি ভাই, মিস্ অশ্রুকণা যা লেখাপড়া শিখছে, আর যা শুশ্রী চেহেরাখানা, রান্নাঘরে না ঢুকে যদি একটিবার 'ফিল্ম' ঘরে নেমে দাঁড়ায়, লজ্জায় হার মেনে যায় বিলেতী ছবিগুলো। ওরা বড়লোক, লেখাপড়া শিখে ওরাই তো সবাইকে পথ দেখাবে ।"

গম্ভীরভাবে গরম চায়ে ঠোঁট-দু'খানি বুলিয়ে মন্তব্য করেন প্রথম ব্যক্তি, "আমাদের দেশের নারী-জাতটা যদি হাটে, ঘাটে, খেলার মাঠে, অফিসে স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ লাভ করে, তাহলে তাদের উন্নতি তো হবেই "।

চা স্পর্শ সুখের অবসর দিয়ে ঠোঁটের কথা কেড়ে নিয়ে সুরু করেন তৃতীয় লোকটা,—"—আমাদেরও কর্ম্মশক্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়, ঠিক এই গরম চা এরই মত।"

স্বীয় মন্তব্যের এরূপ স্বপক্ষ সমর্থনে কাষ্ঠোল্লাসে 'হে হে' করে একটা রুক্ষ হাসি হেসে মূল বক্তা যে হাসির ঢেউ তুললেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহারই তরঙ্গ হস্তস্থিত চা পেয়ালাতে পৌঁছ'তে বাকী রইল না। ফলে দ্বিতীয়বার চুমুক দিতে কণ্ঠপথে ঊর্দ্ধ বায়ু তরঙ্গ সংঘাতে যে কাশির

সৃষ্টি করে বসলো তারই বেগ সামলাতে এক ঝলক গরম চা গিয়ে ছিটকে পড়্‌ল পাশের ভদ্র লোকের ইস্ত্রি করা সাদা জামার বুকে।

নিজের বুকে গরম চা পড়লে নিশ্চয়ই তিনি মোটেই ক্ষুব্ধ হতেন না। কেননা মানবীয় বুকে চা এর উষ্ণতা এবং গ্লানি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু, সাদা জামার বুকে চা এর এই কলঙ্ক কালিমা,—একান্ত অনভ্যস্ত অভদ্রতা, সন্দেহ নাই। তাই সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তিতে লাফিয়ে উঠে বলেন তিনি,'—"ধ্যেৎ তোর স্ত্রী স্বাধীনতা।"

সহানুভুতির সুরে বলতে থাকেন সামের ভদ্র লোকটি, "ও ভাই দমটা সামলাতে পারেনি, তাই! এই গরম চা আমাদের কর্ম্মশক্তি দিয়েছে শতগুণ বাড়িয়ে'। আমরা চা খাই বলেই ঘুণে খাওয়া চাল মিশানো কাঁকর হজম করে ও দিন রাত অফিস. কল কারখানায় যে অক্লান্ত শ্রম করে যাচ্ছি, তা কি পারতো আগেকার ঘৃতান্নভোজী চা অপরিজ্ঞাত লোক গুলো। আর ওদেশের লোক যে এতটা শ্রম হাসি মুখে সহ্য করে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে অপূর্ব্ব সাফল্য বিধান ক'রে চলেছে,—সে তো শুধু এই চা আর স্ত্রী স্বাধীনতা প্রসাদেই। ক্লান্তি বোধ করতেই পাশে থেকে মেয়েরা প্রেমাঞ্চল ব্যজন ক'রে শ্রম বিদূরিত করেন, প্রেম কটাক্ষে প্রেরণা জোগান, আর গরম চা জোগায় উদ্যম।"

বক্তার ভুল ধরে বলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি, "ওহে! ব্যাকরণ-গত ভুল করছো কেন, গাউনের আর প্রেমাঞ্চল কোথায়? বরং বল প্রেম-রুমাল ব্যজন করে।"

নারীর প্রশ্ন

"আহা হা, বলতে দাও না ভাই; বলতে দাও। ভাবটা কেন নষ্ট করে দিচ্ছ ব্যাকরণ গত সন্ধির ভুল ধ'রে।" দুঃখ করে বলেন তাদেরই একজন।

অসমাপ্ত মন্তব্যটা সমাপ্ত করতে বক্তা সুরু করেন আবার, "সুতরাং পুরুষেরাও শ্রমকে শ্রম ব'লে গ্রাহ্যই করেন না। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও সঙ্গিণীর কোলে মাথা রেখে তারা সুখে মরতে পারেন সহমরণ হ'য়ে।"

"ঠিক তাই।—এই স্ত্রী স্বাধীনতা, নারী জাগরণ দেশের পক্ষে হ'বে "আশ্চর্য্য নবশক্তি টনিক।" ব'লে ভাবের আতিশয্যে দোর্দ্দণ্ড চপেটা-ঘাত করেন টেবিলে কাগজখানার বুকে, দলেরই অপর একজন সদস্য।

তক্ষুনি রসিকতা জোড়েন আর একজন,- "আর ভাই, আমাদের গরম দেশের দুপুরে অফিসে যা গরমের উত্তেজনা, তার সঙ্গে গরম চা এর উদ্দীপনা, আর নারীর প্রেম কটাক্ষের প্রেরণা, এই ত্র্যয়স্পর্শ যোগে যে টনিকের কাজ করবে, তাকে ঠাণ্ডা করতে স্বাধীন নারী জাতীর গাউন, অঞ্চল বিহীন বলেই না ফ্যানের আশ্রয় ভিন্ন, নাস্তেব গতিরন্যথা। ধন্যরে বিজ্ঞান; তাই তো সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার সঙ্গে বিজ্ঞান স্বাধীন-তারও প্রয়োজন।

"আর আমি ভাই ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের সরকার বাহাদুরকে যে সুবুদ্ধি করে এহেন চা এর কন্ট্রোল ব্যবস্থা করেননি। এখন দয়া করে দেশের সমাজ থেকে নারী কন্ট্রোলটা একবার ছেড়ে দিলেই, ব্যস্।— বলেই একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করেন বক্তাদের একজন।

এম্নিভাবে ক্ষুদ্র শহরটিকে প্রানবন্ত করে তোলেন এরা।

(*)

এগার

মিস্ সেন কলেজের একজন অধ্যাপক। তাহারই প্রচেষ্টায় ওই নারী বাহিনীর প্রথম উদ্বোধন হয়। ক্রমে, কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের লইয়া এবং তিতুকে পাইয়া সোৎসাহে তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।

শ্রীমতী সেনের পিতা এই একটি মাত্র কন্যার বিবাহে যথাসাধ্য বরপণ ও যৌতুকাদি দানে স্বীকৃত থাকিয়াও যখন কোন উপযুক্ত বরের সাড়া লাভ করিলেন না, তখন তিনি স্থির করিলেন, দেয় বরপণাদি খরচা দ্বারা কন্যাকে বরং উচ্চশিক্ষা দিবেন, তথাপি মেয়ে কালো বলিয়া একটা অজ-গজের হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করিবেন না। মলিনার সত্যই দুর্ভাগ্য যে সুষ্ঠু অঙ্গ-সৌষ্ঠব সত্বেও একমাত্র গাত্রবর্ণ কালো হওয়ায় অপরাধে যথা-সম্ভব কাঞ্চন মূল্যাদির বিনিময়েও কোন উপযুক্ত বর বিবাহ করিতে রাজী হইলেন না।

শ্রীমতী মলিনা সেন বি, এ, পাশ করিয়া পিতার অকাল মৃত্যুর পর শিক্ষয়িত্রী রূপে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন।

রং ময়লা বলিয়া ঠাকুরদাদা তামাসা করিয়া রূপসী বলিয়া ডাকিতেন মলিনাকে শিশুকালে। আর আদর করিয়া বলিতেন, "কোন শালা যদি না-ই নিতে চায় তবে আমিই আছি, কি বলিস রূপসি?" শিশু-মলিনা সে পরিহাসে যোগ দিত ঠাকুর্দ্দাকে আচড়-চিমটি কাটিয়া,, আর মুখ ভ্যাংচাইয়া।

তার পর যৌবনে যখন একদিন সেই নিষ্ঠুর পরিহাস নিদারুণ সত্য রূপে দেখা দিল, মুসড়াইয়া পড়িল সমগ্র দেহমন একটা অভিমান জড়িত লজ্জায়। বেদনায় মনমরা হইয়া গেলেন একেবারে।

নারীর প্রশ্ন

পরলোকগত পিতামহের স্নেহ পরিহাস যে এমনই সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিবে; এ কল্পনা বাস্তবিকই কোনদিন করে নাই সে। আজ হৃদয়ের ব্যথা তাই আত্মমর্য্যাদায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। তার উচ্চশিক্ষা, কার্য্যকুশলতা, অমায়িক ব্যবহার আর সুগঠিত যৌবনশ্রী আজ কাহাকেও যে প্রলুব্ধ করে নাই এমন নহে, কিন্তু, অভিমানে বিমুখ করিয়া দিয়াছেন তাহাদের পাণি প্রার্থনা, শ্রীমতী সেন। তাই আজিও তিনি অবিবাহিতা। অধ্যাপনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া স্ত্রীশিক্ষা নারী কল্যাণ প্রভৃতি কল্পে বিবিধ পরিকল্পনায় গড়িয়া তুলিয়াছেন এই বাহিনীটিকে।

শৈশবে রূপসী থাকিয়া কৈশোরে হইয়া গেলেন মলিনা; সম্ভবতঃ ময়লা রং এর জন্যই। কিন্তু, কোন প্রকার অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্য ছিলনা উহার পশ্চাতে।

প্রথম দর্শনেই তিতুকে স্নেহের দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীমতী সেন: এবং অতি অল্পদিনেই সেই স্নেহস্পর্শের ভিতর দিয়া পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হইলেন তিতুর অন্তরের ব্যথা।

নারী হৃদয়ের ক্ষুব্ধ, পদদলিত স্বাভাবিক আত্মচেতনা জাগ্রত হইয়া ওঠে সমব্যথীর বেদনা সংস্পর্শে। তাই সেদিন তিনি স্নেহভরে উপযুক্তা কর্ম্মী-জ্ঞানে তিতুকে পরিচালিকার দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া নিজে সম্পাদিকার স্বাক্ষর কার্য্যভার টুকু রাখিলেন মাত্র।

ঘনিষ্টতা গড়িয়া উঠিতেই শ্রীমতী সেন দুই একবার আসিয়াছেন চন্দনগড় রায় বাড়ীতে। তিতুর মা এবং জ্যাঠাইমার সঙ্গেও একটা

নারীর প্রশ্ন

ডাকাখোজা সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। আর সেই সূত্রেই তিতু শ্রীমতী সেনকে ডাকে মাসিমা।

অমলকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় হইয়া গিয়াছে অধ্যাপক মলিনা সেনের; গৌরিশঙ্করকে তিনি পূর্ব্বেই জানেন।

গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট উদ্যমের সহিত প্রচারকার্য্য চলিয়াছে নারী বাহিনীর; চন্দনগড়ে এবার অধিবেশনের পালা! অশোক অমলকৃষ্ণকে জানাইয়াছে পৌরহিত্যের আমন্ত্রণ। তিনি রাজী হইয়াছেন তাহাতে।

সভার দিন সকলে উপস্থিত। তখনও লগ্নটা কিছুটা বাকী. গৌরিশঙ্কর আসিলেন অমলের কক্ষে। জানাইলেন, তাহাদের যাইতে হইবে আশ্রমে, শহরে; আজই, বিশেষ প্রয়োজনে। প্রত্যুত্তরে অমল বাহিনীর সভার বিষয় উল্লেখ করিতেই স্নেহবিজড়িত শাসনের সুরে হাল্কাভাবে বলিলেন গৌরিশঙ্কর, "let the girls do it" (ওসব মেয়েরা করুক) অশোক রয়েছে তিতু আছে, শ্রীমতী সেন রয়েছেন, আর আমি দত্ত দাদাকে বলে রেখেছি: সব ঠিক হবে।

"আমি যে কথা দিয়ে" অমলের উক্তি শেষ না হইতেই অভিভাবকের সুরে উত্তর করিলেন গৌরিশঙ্কর.— "বেশত; আরও শিক্ষক তো রয়েছেন। খাবার খেয়ে নাও শীগগির ক'রে"।

ঠিক সেই সময়ে বিশেষ ব্যস্তভাবে সেথায় প্রবেশ করে অশোক। আর তেমি ব্যস্তভাবেই জানায় অমলকৃষ্ণকে "কই, চলুন অমলবাবু"। আমরা সবাই যে বসে আছি আপনার প্রতীক্ষায়।"

অশোকের কথার জবাব দিয়ে জানান গৌরিশঙ্কর. "ওকে যেতে হবে আশ্রমে: আমিও যাচ্ছি সেখানে বিশেষ প্রয়োজনে।"

নারীর প্রশ্ন

"আমরা সবাই যে—"। অশোকের কথা শেষ না হইতেই স্নেহের সুরে বলেন গৌরিশঙ্কর,

'বেশতো; তোমরা সবাইমিলে মেয়েদের ডেকে সবকিছু বুঝিয়ে দাও গে। আর আর শিক্ষকেরা তো রইলেন। যাও, আরম্ভ করগে।"

অমল প্রথম পরিচয়াবধিই গৌরিশঙ্করের স্নেহশাসন মাথা পাতিয়া মানিয়া চলে। অশোকও এই লোকটির কাছে আসিয়া শান্ত হইয়া যায়। তাই আজিও নিরুত্তরে চলিয়া যায় সে।

ব্যবসা বুদ্ধির পশ্চাতে রাজনৈতিক মানব পরিচালিত ১৩৫০ সনের নিরীহ জনগণ বিনাশী দুর্ভিক্ষের তাড়নার পরে আবার যখন প্রকৃতি তার নিষ্ঠুর ক্ষোপদৃষ্টি হানলেন পূর্ব্ববঙ্গের হতভাগ্য নরনারীর উপরে বন্যার প্লাবন ছুটিইয়ে, চট্টগ্রামে তাহারই কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রেরণ মানসে গৌরিশঙ্কর আলাপ আলোচনা করবেন আশ্রমের আর আর গুরুভাই-দের সঙ্গে। অমলকৃষ্ণও তাই শেষ পর্য্যন্ত নিরুত্তরে সাইকেলখানি নিয়ে অনুগমন করলেন গৌরিশঙ্করকে শহরের পথে, একান্ত বাধ্যানুগত শিষ্যের মতই।

—(*)—

বার

নীলিমাও এই শহরের বিদ্যালয়ের ছাত্রী, বাহিনীর একজন সভ্যা আর আর অনেকেরই মত।

উত্তর বঙ্গের কোনও এক জেলায় একটি সরকারী পদে কাজ করতেন তার পিতা। যে সামান্য বেতন লাভ করতেন তাহাতে কতকগুলি পোষ্যসহ সংসারের অনিবার্য্য ব্যয় সঙ্কুলানান্তে ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা ভিন্ন মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিবার মত কোনই উদ্ধর্ত্ত সংস্থান ছিলনা। বিবাহযোগ্যা বয়স হ'তেই তিনি নীলিমাকে বিয়ে দিলেন।

জন্ম হ'তেই নীলিমা গড়ে উঠেছিল শহরে। শহরের আবহাওয়া তাহাকে আকৃষ্ট করেছিল। পিতার কেরাণী পদে আয় অতি স্বল্প; এবং, তিনি যে বিভাগে কাজ করতেন তাহাতে কণ্ট্রোল তালিকাভুক্ত বিভাগ সমূহের ন্যায় উপরি কোনরূপ আয় ছিলনা। বিশেষতঃ, তার চাকুরীর উল্লেখযোগ্য জীবনে কন্ট্রোল প্রথার প্রবর্ত্তনও হয় নাই।

শৈশবে তিনি মানুষ হয়ে ছিলেন পল্লীতে, শহরের মোহ তাকে বশ করতে পারে নাই। শৈশবের সংস্কার এবং চাকুরে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে পীড়া দেয়। সাহেবী কায়দায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার পক্ষপাতি তিনি কোনকালেই নন্।

পাশের সরকারী-চাকুরীওয়ালাদের সাহেবী কায়দাকানুন নীলিমার প্রাণে আতুড় আকাঙ্খার বেদনা জাগিয়ে দেয়। ভাবী জীবনে চা-পেয়ালা-ডিশ-পুষ্ট রং-চং এর একখানি হাল্কা সংসার গ'ড়বার বাসনা তার প্রাণে শৈশব হতেই শিকড় গেড়ে বসে আছে।

নারীর প্রশ্ন

তার শিশু 'ডলি' 'নেলী'কে সে রা'খবে শুধু ইজার পড়িয়ে আর ফ্রক গায়ে দিয়ে। কক্ষনও কাপড় পরাবে না পাড়াগায়ের মত।

পিতা একদিকে যেমন পল্লীর মুক্ত আলো হাওয়ার স্নেহ পরশের মমতা ভুলতে পারেননি, অপরদিকে তেমনিই সারাটা জীবব চাকুরী (চারক ; ঈ) খেটে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর অযথা ভিরকুটি সয়ে সয়ে. অন্তঃসারশূন্য বহিরাড়ম্বরপূর্ণ চাকচিক্যময় শহুরে জীবন-ধারার প্রতি বিতৃষ্ণ-হ'য়ে পড়েছিলেন। তিনি আরও লক্ষ্য ক'রেছিলেন যে, পল্লীর স্বাভাবিক সরল প্রকৃতির অঞ্চলতলে বর্দ্ধিত পল্লীবাসী আত্মীয়তা বন্ধনের ভিতরে হাল-চাষ ক'রে, কুটির-শীল্প গ'ড়ে দেশের সেবা ক'রে চলেছে নীরবে, জাতীর মুখে অন্ন, ধমনীতে রক্ত, শরীরে মাংস আর হৃদয়ে বল সঞ্চার ক'রে। আর শহরের কৃত্রিম; বিকৃত প্রকৃতির আশ্রয়ে বর্দ্ধমান বিকৃত-স্বভাব, সভ্য, শিক্ষিত মানব পল্লীবাসীর উৎপাদিত ধন অপহরণ করবার কৌশলজাল বুনিয়ে. চলে বাক্যের আড়ম্বরে, দু-র্বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় দিয়ে। আর এই অপহরণের উপায় লোকচক্ষে প্রকাশ পেয়ে একটির পর একটি যখন ব্যর্থ হ'তে বসে. --তখনই আবিষ্কার সুরু হয় নবীন পন্থার। শহরে ব'সে তীব্র খল মস্তিষ্কের সুচিন্তিত বাক্যবাণ-রাশি ছুড়তে সুরু করেন স্বীয় দল মারফতে সুদুর পল্লীতে, যতক্ষণ না সেই শরাঘাতে তাদের আত্মীয়তা বন্ধন হয় ছিন্নভিন্ন, শান্তি হয় ব্যাহত।

তাই পল্লীর দরদ তাকে স্থির করিয়েছিল যে, মাতৃস্নেহ-বিহীনা নীলিমাকে তিনি বিয়ে দিবেন পল্লীতে, গৃহস্থের সংসারে; — যেখানে গোলাভরা আছে —ধান, দুধভরা গরু। কন্ট্রোলের দুর্ণীতিপূর্ণ খাদ্য-বন্টন ব্যবস্থা এখনও যাদের অনাহারে রাখার পূর্ণ সুযোগে পৌছায়নি।

নারীর প্রশ্ন

সরল প্রাণ আজিও যাদের সঙ্কুচিত হয়না পীড়িত অতিথি-অভ্যাগতের আগমনে; —শহরকে শোষণ করে না যারা, বরং নিজেরাই শহুরে জীবনের ফন্দীবাজীতে শোষিত হ'য়ে দধিচীর মতই আত্মদান ক'রে চলে নীরবে।

নীলিমার বিয়ে হ'য়ে গেল উত্তর-বঙ্গেরই কোন একটি পল্লীতে... অবস্থাপন্ন গৃহে।

নীলিমার মনে হ'ল, 'এরা বড়ই গেঁয়ো'। —কিন্তু, দেখলে, বাসি-লাউডাটা, শাক-সব্জী, আর বাসী-মাছ এরা খায়না; ওসব খায় তাদের গরু, ছাগল আর বিড়ালে।

উঠান ভর্ত্তি ধান আর খড়ের গাদা নীলিমার মন ভারি ক'রে দেয়। এত ভারি সংসার সে চায়না যে! অতিথি-অভ্যাগতের আতিথেয়তা, বারোমাসের ছোট-খাটো তের পার্ব্বণ, আর সেই উপলক্ষে প্রতিবেশীদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর উদ্যোগ-আয়োজন, সম্বৎসর নানা শস্য খুঁটিয়ে ঘরে তোলা, এম্নি সমস্ত শারীরিক আয়াসসাধ্য নিত্যকর্ত্তব্য তাকে হাপিয়ে তোলে। —ঝি-চাকর আছে বটে; শ্বাশুড়ী বলেন,- "সব কিছুই কি আর ওদের উপর ফেলে রাখতে আছে"?

"দূর ছাই! বাড়ীময় এই শস্যের জঞ্জাল,- আর গ্রাম্য সংসারের নিত্য-কর্ত্তব্য বড়ই বিশ্রী! ধান ঘাটতে গেলে শূক বিঁধে যে। সে থাকবে জুতো প'রে শহরে,--যেখানে এই শূক আর খোসাগুলো বাদ দিয়ে এরা পৌঁছে দেবে দুধের মত সাদা ধব্‌ধবে চালগুলো শুধু'!

পল্লীতে নীলিমার প্রাণ উঠলো বিষিয়ে। পল্লীর মেয়েরা না জানে কথা কইতে, না শিখেছে সভ্য আচার ব্যবহার; - পল্লীর বধূ এতটা

নারীর প্রশ্ন

ঘোমটা টানে মাথায়, ছিঃ! নীলিমার প্রাণ বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো।

স্বামী তার ব্যবসায়ী দোকানদার ;—কেমন ক'রে সে এই দোকানদার স্বামীর পরিচয় দিবে তার বাল্য বন্ধুদের কাছে,—যারা কেউ বা 'মার্চ্যান্টস্ ক্লার্ক,' ষ্টল-হোলডার', 'ব্রোকার', 'বিজিনেস্‌ম্যান্', কিম্বা সরকারী অফিস-ক্লার্কের সহধর্ম্মিণী। মহেন্দ্র না জানে আধুনিক ভাবে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম-কলা-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়ে নীলিমাকে আপ্যায়িত করতে ;—এখানেও যেন তার দোকানদারী ভাব, ওজনকরা সব কিছুর 'স্পেকুলেসান',—লজ্জা!

শ্বাশুড়ীকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না নীলিমা। বিধবা শ্বাশুড়ী ;—গলায় তার ছোট তুলসীর মালা, চুলগুলি ছোট ক'রে ছাটা, স্নান ক'রে কপাল আর নাকে কাটেন তিলক। একি অসভ্য চৈতন্য যুগের বোষ্টমী দৃশ্য!

এ ছাড়া সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ, আর গৃহদেবতার সাম্নে সকাল-বিকাল প্রনাম। আরও কত কি ;—যা নীলিমার বর্ত্তমান সভ্য শিক্ষার কাছে একান্ত অপকর্ত্তব্য ব'লে বোধ হয়। জীবনকে এম্নিভাবে ব্যর্থ ক'রে দিতে নীলিমার প্রাণ অস্বীকার ক'রে বসলো।

মহেন্দ্রের মাতা শিক্ষিতা। বধুর আদর যত্নের ত্রুটি করেন না। পাড়ায় বেড়াতে নিয়ে পুত্রবধুর শিক্ষার ব্যাখ্যা ক'রে আনন্দ করেন, —নীলিমা গর্ব্ব বোধ করে। কিন্তু, বর্ত্তমান সভ্য সুরুচিবিহীন দোকানদার স্বামী, বোষ্টমী শ্বাশুড়ী আর প্রাচীন সংস্কারদুষ্ট পল্লীবাসীর সাহচর্য্য তার আদৌ ভাল লাগলো না।

—(*)—

তের

মহেন্দ্রের পিতা ব্যবসা এবং চায় আবাদের শুভ আশীর্ব্বাদে বেশ দু'পয়সা রেখে গেছেন। পিতার ইচ্ছা ছিল না যে, পুত্রের পশ্চাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লম্বা ডিগ্রীর ভার যোজনা করে পুত্রের বাস্তব সংসার কর্ম্ম-ক্ষমতা বিনাশ পূর্ব্বক পুত্রদায় অবস্থায় চাকরী পণের টাকা পকেটে করে কর্ম্ম কর্ত্তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান। তিনি বুঝেছিলেন, বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষিত পুত্রের চাকরী, আর উচ্চ শিক্ষিতা কন্যার বর সমস্যা উভয়ই তুল্য! ফলে পুত্র উপার্জ্জন বিহীন, পিতার গলগ্রহ ;—কন্যা স্বামী বিহীনা সমাজের গলগ্রহ (?)।

মাট্রিক পাশ ক'রে মাতার নির্দ্দেশানুযায়ী পরলোক গত পিতার ইচ্ছাই পূর্ণ করেছিল মহেন্দ্র। ব্যবসা দেখা শুনায় মন দিয়েছে সে।

* * *

বিয়ের পরে পিতৃগৃহে ফিরে পিতাকে জানায় নীলিমা, আপাততঃ আর শ্বশুড়ঘরে যাবে না সে ;—লেখা-পড়া করবে এই শহরে থেকেই; —পিতা সরলভাবে সম্মতি দিতে পারেন না মেয়েকে।

কিছুদিন পিত্রালয়ে কাটিয়ে আবার স্বামীগৃহে ফিরে আসে নীলিমা। এবার সাথে নিয়ে আসে অনেকগুলি পুথি পুস্তক। স্বামীকে জানায়,—লেখা পড়া করবে সে, আর সেজন্য প্রস্তুতও হয়েছে এবারে। খুশী হয় মহেন্দ্র।

এখন প্রায় সারাক্ষণই বই নিয়ে কাটায় নীলিমা ;—পাঠ্য কি অপাঠ্য শ্বাশুড়ী তা বোঝেন না। শুধু জানতে পেরেছেন যে, বৌ লেখা-পড়া করতে আবার চলে যাবে শহরে।

নারীর প্রশ্ন

"বিবাহিতা স্ত্রীলোক লেখা-পড়া করতে যাবে স্কুল-কলেজে, সে আবার কি? আর এতটা লেখা-পড়া শিখেই বা কি হবে, মেয়েরা তো চাকরী করবে না? যদিই বা কেউ করে,—কিন্তু, মা লক্ষ্মীর কৃপায় তাদের তো আর কোন কিছুর অভাব নাই! এক মহেন্দ্র —মা ষষ্ঠির তেমন দয়া যদি হয়ই, তবু অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা বৌকে দেখতে হবে না। সুতরাং, নীলিমার ভবিষ্যৎ লেখা-পড়া শিক্ষার আগ্রহে শ্বাশুড়ীর তীব্র অমতই দেখা গেল।

নীলিমার পাঠানুরাগের ক্রমে এত প্রাবল্য দেখা দিল যে, প্রায়ই রান্না করে বৌকে ডেকে খাওয়াতে হয় শ্বাশুড়ীর। নীলিমা যেন এসংসারের কেউ নয়, দু'দিনের অতিথি মাত্র;- এম্নিভাবে দিন কাটাতে থাকলো। ক্রমে শ্বাশুড়ীর বুকেও পুত্রবধূ-স্নেহের অভাব দেখা দিল। অবশেষে বিদ্যানুরাগের প্রাবল্য দেখিয়ে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হতেই একদিন সে চলে গেল আবার পিতৃগৃহে,- শহরে।

পিতা বিস্তৃত তথ্য সবই অবগত হলেন। মহেন্দ্রের সম্মতি সম্বন্ধেও তাঁর সন্দেহ থাকলো। শৈশব থেকেই তাকে তিনি বেশ জানেন। নীলিমার লেখা পড়ায় মত প্রদান করলেও উহা যে মহেন্দ্রের সারল্য সুলভ মাত্র—কোন-কিছু ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বিচার বিতণ্ডা কিম্বা বিরোধিতার স্পর্দ্ধা রাখে নাই সেটীও তিনি বুঝেছিলেন।

নীলিমার মতিগতি সমস্তই তিনি লক্ষ্য করছিলেন, কন্যার এরূপ মনোভাব সমর্থন করতে পারলেন না। আব্দারে অন্ধ না হয়ে জানালেন,—"শ্বাশুড়ী সম্মত না হলে তুমি পড়তে পাবে না। বরং,

অসময়ে বার্দ্ধক্যে কাছে থেকে তাঁর সেবা করতে হবে।”

পিতার এরূপ কঠোর নির্দ্দেশে পিতার প্রতিও বিগতশ্রদ্ধ হ’য়ে বসলো নীলিমা। পরিশেষে স্পষ্টই জানালো যে, লেখা-পড়া না করলেও দোকানদার স্বামী আর বোষ্টমী শ্বাশুড়ীর সহবাসে পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত পরিবেশে বাস করতে পারবে না সে। পিতা নিতান্ত মর্ম্মাহত হলেন।

পুথি-পুস্তক ক্রয় বাবদ নীলিমাকে কিছু অর্থ পাঠিয়ে দিল মহেন্দ্র। নীলিমার বিদ্রোহী মন তখন অভিমানে পূর্ণ। তার আশা ছিল,—শৈশবে সে মাকে হারিয়েছে, পিতার স্নেহ সে অভাব পূর্ণ করে রেখেছে এতকাল,—তার যে কোনও আব্দার নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন সেই পিতা। কিন্তু, ওই স্নেহময় পিতা ও যখন তার দুঃখ বুঝলেন না,—সে আর কারও সাহায্য চায় না। বিশেষ ক’রে, যে স্বামীর ঘর করবে না, তার সাহায্যই বা কেন নিতে যাবে সে! তাই, সম্ভাব্য কারণ জানিয়ে ওই টাকাটাও ফেরৎ পাঠালো নীলিমা।

এর পরেই সে সুযোগ খুঁজতে থাকে স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালিত পথের সন্ধানে।

—(*)—

চৌদ্দ

ভগবান কারও একান্ত ইচ্ছার পথ বড় একটা রুদ্ধ রাখেন না ;—নীলিমার পথের ও একটা সহজ সন্ধান মিলে গেল।

নীলিমা যখন বুঝতে পেল, স্বামীগৃহে না গিয়ে পিতৃগৃহে থাকতে গেলেও পিতার বিরাগভাজন হওয়াই সুনিশ্চিত, তখনই আবিষ্কৃত পন্থাটি অবলম্বন ক'রে চলে এল শ্রীমতী সেনের আশ্রয়ে, —ঐ বিদ্যালয়ে।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে লবণের নিয়ন্ত্রিত মূল্য ছয় আনা হলেও, বাঙ্গালা এবং আসামের কোন কোন অংশে চার টাকায় ও যখন তা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল, তৎকালে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে লবণ সরবরাহের ভার প্রাপ্ত হ'য়ে সদাশয় ইংরেজের কৃপায় নিরাশয় ব্যক্তি ও মহাশয় ব'ণে গেলেন। চাউলাদি খাদ্য জোগানের ভার পেয়ে কেউ কোটি কো'টি পতি হ'য়ে পড়লেন; আর তারই দাম জোগাতে গিয়ে দেশের লোক হ'য়ে পড়লো সর্ব্বস্বান্ত।

হতভাগ্য বুভুক্ষুর অখাদ্য কুখাদ্য গলাধঃকরণের দোসর লবণটুকু অপহরণ ক'রে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার মতই স্তুপীকৃত ধন-সঞ্চয় ক'রে কেউ বা বাঙ্গালার ধনকুবের সেজে বসলেন। দিল্লী থেকে মহামহিম রাজ প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ করে স্বীয় পল্লীবাসে এনে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রণামি দিয়ে সদাশয় সরকার বাহাদুরের প্রসাদ লাভ করলেন উপাধি ভূষিত হয়ে।

নারীর প্রশ্ন

উক্ত সঞ্চিত ধনরাশির অপর একটা অংশের সদ্ব্যয় দেখেও লোকে স্তম্ভিত না হ'য়ে পারলো না। ছোট শহরের বালিকাবিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়টিও উহারই একটির প্রকাশ।

বিদ্যালয়ে, প্রথমতঃ বেতন এবং 'হোষ্টেল' উভয়ই 'ফ্রি' ক'রে দেওয়া হ'ল। ফলে, বিদ্যালাভের প্রেরণায় না হ'লেও দুর্ভিক্ষের তাড়নায় অতি স্বল্পকাল মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা এত বেড়ে গেল যে আর কিছুতেই 'সীট' সঙ্কুলান হ'ল না। নীলিমাও উক্ত সংবাদ জেনে সেই সুযোগে এখানে এসে ভর্ত্তি হ'য়ে পড়লো শ্রীমতী সেনের অভিভাবকত্বে।

তৎপরে, অবস্থা বিশেষে 'সীট' অসঙ্কুলান হেতু কর্ত্তৃপক্ষ হোষ্টেল ফ্রি বন্ধ করে দিতেই সে সমস্যারও সহজ সমাধান হয়ে গেল নীলিমার। আর সেই অবধি চন্দনগড় রায়গৃহের একজন অতিথি সে, —একই সঙ্গে বিদ্যালয়ে যায় আসে তিতুর 'রিকসতে'।

প্রথম দিনটিতে তিতুর সঙ্গে এই অচেনা নবীনা সঙ্গিনীর আবির্ভাব অশোকের সোৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই নীলিমা জানায় ছোট্ট একটি নমস্কার। অশোক ক্ষণেকের জন্য ভুলে যায় প্রতিনমস্কার জানাতে। পরমুহূর্ত্তেই সে শুধরে নেয় আপনাকে। এরই মধ্যে দু'জনার যে দৃষ্টি বিনিময় হ'য়ে গেল, তা'তেই অশোকের নিভৃত অন্তর তলে যেন অকস্মাৎ তল্লাসী সুরু হয় কোন জন্মের ভুলে যাওয়া স্বপ্ন স্মৃতির ছায়াকে।

নীলিমাও জানাতে চায় তার প্রথম দৃষ্টিতেই,—"আমায় চিনলে না বুঝি? আমি যে তোমায় চিনি অনেকদিন আগেই।

নারীর প্রশ্ন

বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হ'য়েই সে জানে কর্ম্মী অশোককে ; প্রাণ তার বলতে চায় শুধু,—"রায়গৃহে আজ নূতন অতিথি হলেও তোমার দ্বারে যে আমার আতিথ্য বহুদিনের।"

অশোক ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না তার সে আবেদন, তবু কিন্তু সাড়া দেয় তার অন্তর।

তিতু পরিচয় করিয়ে দেয় সকলের সঙ্গে নীলিমার ; রিকসচালক ভৃত্য ততক্ষণ উঠিয়ে রাখে জিনিষ-পত্রগুলি। তিতু, অশোক আর নীলিমা গিয়ে বসে তিতুর ঘর খানিতে।

—"তিতু সৌন্দর্য্যশালিনী, নীলিমা ও সুন্দরী বটে! বিশ্বশিল্পী তার গাত্রবর্ণের শুভ্রতা সমপাদনে যে টুকু কৃপণতা ক'রেছেন তৎপূরণকল্পে মানব শিল্পীর প্রসাধন ব্যবহারে মোটেই কার্পণ্য করেনি নীলিমা।—অঙ্গ-সৌষ্ঠব তার প্রশংসনীয় ; চোখে চঞ্চলতার ভঙ্গী, প্রতি অঙ্গে যৌবনের উন্মত্ত আকাঙ্খার উন্মাদ তরঙ্গ। পরিচ্ছদে আধুনিক রুচিবিলাসের পরিচয় দেয়, হাব-ভাবে প্রকাশ করে আত্মাহঙ্কার।

নীলিমা লক্ষ্য করে অমলকে। সে নাকি একদিন শুনেছিল তার পিতারই মুখে,—'বেশ-ভূষার পারিপাট্য দিয়ে যারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, চলা-ফেরার গতি-ভঙ্গী যাদের সচ্ছন্দ সরল, মানুষের সঙ্গে যারা পরিচিত হ'তে চায় না সাজ-সজ্জা আর অঙ্গ-ভঙ্গীর পারিপাট্য দিয়ে তারা নাকি সংঘাতিক লোক,—অন্যায় অবৈধতা কখনও সইতে পারে না তারা।

পরিচয় প্রসঙ্গ শেষ হতেই সেদিন উঠে পড়েন সবাই। গৃহে ফিরবার কালে অশোক আর একবার দৃষ্টি বিনিময় ক'রে নেয় নীলিমার সাথে,—ভাল লাগে তার তেমি দৃষ্টির আদান প্রদান।

(*)—

পনর

দাদার মৃত্যুতে গৌরিশঙ্কর ঘর নিলেন সত্য কিন্তু কাছারীর ভার এবং খাজনা-পত্র কার্য্যাদি আদায় সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার মদন দত্ত নিজের হাতে গুছিয়ে নিলেন। প্রজাদের এবার আর বুঝতে বাকী রইলো না যে মেজকর্ত্তার দত্ত দাদাই এখন হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। —দত্ত পাঠশালা ছেড়েছিলেন অতি শৈশবে; —এবার সেই শৈশব লব্ধ বিদ্যা আর যৌবন লব্ধ বুদ্ধির দৌড়ে দপ্তর চালিয়ে চল্লেন বেশ।

সেদিন দত্ত মশাই কাছারীতে ব'সে আছেন; দপ্তরের প্রাচীন কর্ম্মচারীর উপস্থিতিতে দুই চারজন প্রজা এসে বসেছে নীচে, —মাদুরে। আরও আছেন জনা কয়েক মোসাহেব।

জনৈক চাষী কাছারীতে ঢুকে সসম্ভ্রমে সেলাম জানায় দত্ত মশাইকে, তারপর এত্তালা সুরু হয় তার অভিযোগের। দত্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই বর্ণনা চলে চাষীর,

—"কর্ত্তা! হাটের ইজারাদার কর্ত্তা, অযথা আমায় অপমান করে আমার মাল কেড়ে নিয়েছে। দয়া করে আমার আর্জ্জি লিখে

রাখুন কর্ত্তা ! মেজ কর্ত্তা ধর্ম্মের অবতার, তার কাছে এ অন্যায়ের একটা সুবিচার হবেই কর্ত্তা !

-'তা আমরা কি আর তোর সুবিচার করতে পারি না কিছু ?"—যেন কর্ত্তৃত্বাভিমানে আঘাত খেয়ে একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই জবাব দিলেন দত্ত।

নাকের ডগার চশমা জোড়ার উপর দিয়ে লোকটাকে ভাল করে দেখে পূর্ব্ববৎ কণ্ঠেই প্রশ্ন করেন আবার,— —

- "তোর নাম কি ; কি মাল নিয়েছে তোর ?"– প্রশ্নের সঙ্গেই কিছুটা কাগজ আর একটা কলম টেনে নেয় দত্ত লিখিবার ভঙ্গীতে। —"আজ্ঞে, আমার নাম 'কাঞ্চু' কর্ত্তা। আর মাল এনেছিলাম কর্ত্তা ঝিঙ্গে।" —উত্তরে সসম্ভ্রমে জানায় চাষী।

দত্ত লিখিবার চেষ্টা মাত্র না ক'রে কপাল খানা ঈষৎ সঙ্কুচন পূর্ব্বক একটা সুচতুর দৃষ্টি দান করলেন লোকটার প্রতি, এবং পরক্ষণেই সমাধান স্থির করে ব'লে উঠলেন, একটা ভিরকুটি কেটে- "যা, যা, যাঃ ;—তবু ভাল। আমি ভেবেছি না জানি কি, কত বড় ব্যাপার। ভারী তো 'ঝিঙ্গে' 'কাঞ্চুর' বিষয়, সে কিনা আবার লিখতে হবে আমাকে ! লিখে রাখুন দেখি ও কি বলে।" —বলেই ইঙ্গিত জানালেন দপ্তরের সেই সরকার মশাইকে।

শৈশবের 'ঙ্গ' 'ঞ্চ' বানান বিশ্লেষণ সমস্যাটা প্রৌঢ় বয়সে কাটিয়ে নিলেন সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে। তৎপরে, নিজের এই দুর্ব্বলতাটুকু সামলিয়ে নিতেই প্রশ্ন জানালেন সম্মুখস্থ একজন

নারীর প্রশ্ন

প্রজাকে,—একটা ভ্রূ-নৃত্যের কছরতে, "কি রে, তোর খাজানা দিবি তো ? টাকা পয়সা এনেছিস কিছু ?"

ট্যাকের গাইট খুলতে খুলতে জানায় লোকটা,—"আজ্ঞে, এনেছি কর্ত্তা ! চেক্ লিখুন, দিচ্ছি সবটা চুকিয়ে।"

—"তোর নাম কি ?"

—"আজ্ঞে, গঙ্গাধর ?"

"খাজনা কত ?"

"আজ্ঞে, ফি' সন তিন আনা দেড় পয়সা। মোট তিন বছরের বাকী।"

দত্ত ঝাপড়ে পড়লেন। আবার সেই 'ঙ্গ' বানানের পালা, আর কড়া ক্রান্তির হিসাব ! কিন্তু ঘাবড়াবার পাত্র তিনি নন ; চট্ ক'রে বুদ্ধি জুটিয়ে ব'লে উঠলেন কৃত্রিম ক্রোধে,

"যত সব ছোটলোক, লাই পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছেন। তিন বছরের খাজনা বাকী ফেলেছিস ; অপেক্ষায় আছিস যে তালুকদারী স্বত্বটা উঠে যায় কি না ? আবার নাম হয়েচেন গঙ্গাধর ! হরিজন কবুলত ক'রে জলচল হয়েছিস বুঝি ? গঙ্গা ; এ্যাঃ ! জলই ভাল। তিন আনা খাজনা দিতে এসে আবার গঙ্গাধর !—তোর নাম দপ্তরে লেখা হ'ল 'জলধর' বুঝলি ? গঙ্গায় আর কাজ নেই।—আর খাজনা এবার জমা বৃদ্ধি হ'য়ে এই হল গিয়ে এই,—পনর পয়সা, আর শিক্ষা সেস্ বৃদ্ধি,—মোট চার আনা। তিন বছরে বারো আনা।"—

নারীর প্রশ্ন

এইবার সোজা চেক্ লিখে বল্লেন, "দে দেখি এইবার বারো আনা ?"

তারপরে তৃতীয় লক্ষ্য হল একজন গো-বেচারী মতন মানুষ। দত্ত তাকে প্রশ্ন জানান্ ধম্‌কিয়ে, "খাজনা এনেছিস ?"

থতমত খেয়ে জবাব দেয় বেচারী, "আজ্ঞে ! আজ যে খাবো সে চা'লটিও ঘরে নাই কর্ত্তা !"

"তাই খাজনা মকুব।"—সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তরে একটা ভেংচি কেটে দত্তের চোখ দুটো বড় হয়ে উঠলো গিয়ে কপালে। হুঙ্কার ছেড়ে উঠলেন তিনি,

"সব হারামজাদা কমুনিষ্টের জোগান ধরেচ ! 'খেতে পাইনা খাজনা বন্ধ কর'। দাঁড়া হারামজাদা ঐ রোদে সূর্য্যের দিকে মুখ ক'রে।"

ছেঁড়া গামছাখানি কাঁধে ফেলে ভয়ে ভয়ে বেচারী গিয়ে দাঁড়ায় বাইরের রোদে। কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ না করায় প্রভুত্ব প্রকাশের ক্ষেত্র প্রশস্ত বোধ করলেন দত্ত ; আর তাই দ্বিতীয় আদেশ হাঁকলেন তার উপরে, "একটা পা তুলে দাঁড়া।" —অম্লান বদনে একটা পা তুলে দাঁড়ায় লোকটা।

কৃতিত্বের গর্ব্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দত্তের মুখখানা। স্বীয় প্রভাবের চরম প্রদর্শনের মোহে গর্জ্জন করে ওঠেন দত্ত আর একবার,— —"ও পা টাও তুলে দাঁড়া নচ্ছাড়।"

ভয়ে আড়ষ্টপ্রায় হয়ে দ্বিতীয় পা'খানিও তুলতে গিয়ে যখন বেচারী দেখলো যে, এ পা'টা তুলতে সে পা নামছে, আর সে পা

নারীর প্রশ্ন

তুলতে গিয়ে নেমে পড়ছে এ পা টা, দিশেহারা হ'য়ে কাঁদ কাঁদ সুরে জানায় সে,—"আমি কিবা (কি-ই বা) করি কর্ত্তা ?"

—"তুই কিবা ও করতে পারবি না মোটেই।" নাজেহাল অবস্থার উপরে প্রভুত্বের ভাবাবেশে দত্ত শেষ আদেশ জারী করে বসে তর্জ্জনিটা উঁচিয়ে। ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে যায় লোকটা।

তর্জ্জন গর্জ্জন শুনে ইতিমধ্যে গৌরিশঙ্কর এসে দাঁড়ালেন সেখানে। নিরুপায় বেচারী কাতরদৃষ্টিতে তাঁর, পানে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চাইতেই স্নেহার্দ্র কণ্ঠে শুধালেন তিনি,—"কিরে, রোদে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?"

—"আমি দাঁড় করিয়ে রেখেছি নচ্ছাড়কে। চার বছরের খাজানা বাকী; সবাই মিলে জোট্ পাকিয়েছে।" বলেই কট্মট ক'রে দত্ত তাকালেন লোকটার দিকে।

নিপীড়িতের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি দান করে বলেন গৌরিশঙ্কর,—"যা, যা ; ছায়ায় যা। খুব অভাব বুঝি তোর,- পারছিসনা বুঝি দিয়ে দিতে ?"— আর সেই সঙ্গে জানালেন, যেন দত্তকেই উদ্দেশ করে ;- "যা দাড়িয়েছে দেশের অবস্থা ! দিন মজুরী করে পোষাতেই পারছে না ওরা।"

স্বীয় কক্ষে চলে গেলেন গৌরিশঙ্কর ; মুখ গুমরে অভিমানাহত দত্ত ব'সে রইলো কাছারীতেই।

—(*)—

ষোল

ছুটির দিনটিতে শ্রীমতি সেন আসেন চন্দনগড়ে বেড়াতে। আলোচনা চলে অমলের ঘরে বসেই. কথা পাড়েন তিনি, --"আশ্রম সম্বন্ধে দু'চারটি কথা কইবো আপনার সাথে; আশ্রম জীবনের ভাব ধারাটি বড্ড ভাল লাগে আমার। সংসারে থেকে কি সম্ভব নয় আশ্রম রক্ষা করা?"

---"সংসার বলতে যা বুঝায়, আশ্রম পালন করতে গেলে আর সে সংসারী থাকা চ'লে না। আশ্রমের প্রকৃত আদর্শ নিঃস্বার্থপরতা; আর বনিক্ বুদ্ধ্যাশ্রিত চলতি যে সংসার সে শুধু স্বার্থকাতরতায় পূর্ণ। তাই পদে পদে ঘটে সংঘর্ষ। তাতে হয় ভেঙ্গে যায় সংসার, আর না হয় ভাঙ্গতে হয় আশ্রম।"— সংক্ষেপে জানায় অমল।

—"কিন্তু সংসারীকে বাদ দিয়ে তো আর আশ্রম নয়?"—

—"দুধকে বাদ দিয়ে যেমন মাখন নয়; জলীয় অংশটা ছেটে ফেলতে হয় শুধু।"

---"কিন্তু, ঐ সং এর মত পোষাক প'রে সাধু সাজবার প্রয়োজনটা কি বলুন দেখি?''—একটু শ্লেষ ভ'রেই যেন প্রশ্ন জানায় তিতু।

সরল হাসি মুখে এনে জানায় অমল---"সাধু সাজবার জন্যও পোষাকের প্রয়োজন রয়েছে যে! সংসারে থেকে মানুষ অনেক ব্যভিচার করে ;— সাধুর পোষাক পরে সে সব করতে গেলে প্রাণে লজ্জা এবং শঙ্কা জাগে। আর জাগে ব'লেই তা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই, বৈধব্য

ব্রতের জন্য বিধবা-বেশের প্রয়োজন, কংগ্রেসীর জন্য খদ্দরের আবিষ্কার।"

—"সাধুর বেশে আত্মগোপন ক'রে সংসারের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রে বেড়ায় যে ব্যভিচারী, মস্ত বড় পাপ নয় কি তারা?' একটা আক্রমনের সুরে প্রশ্নটা ক'রে বসে অশোক।

—"যা কিছু মহান তারই সুয়োগ সুবিধা নিয়ে স্বীয় স্বার্থ বাগিয়ে চলে সুবিধাবাদী লোক মহান আশ্রয়তলে শরণ নিয়ে। যে কোন পবিত্র বস্তুকে চিরকাল ঘৃণ্য ক'রে তোলে এই জাতীয় জীব। অনাদিকাল থেকে সুগন্ধি পুষ্পের আশ্রয়ে শ্বাস পথের পীড়া জন্মায় দুষ্টু কীট।"—শান্ত ভাবে জানায় অমল।

—"যে কোন পথে প্রবঞ্চনা করুক প্রবঞ্চকের পাপ সর্ব্বত্র।—সাধারণতঃ, প্রবঞ্চককে আমরা শাস্তি দেই; আর কোনটিকে করি উপেক্ষা। সে গুলি প্রায় প্রত্যেক চলতি সংসারীর নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে যায় ব'লে। কিন্তু, আশ্রমবাসীর বঞ্চনা আমরা উপেক্ষা ক'রতে পারি না, তাকে ঘৃণা করি সব চাইতে বেশী।" ধীর ভাবে উক্তি ক'রে মন্তব্য জানান শ্রীমতি সেন।

—"তার কারণ, ধর্ম্মকে এযাবৎ আমরা সব চাইতে বেশী শ্রদ্ধা ক'রে এসেছি, এবং আজও তার সম্মান অটুট দেখতে চাই ব'লে।" —দৃঢ়ভাবে মত ব্যক্ত করে অশোক।

—"কোন সংসারীই আজ পর্য্যন্ত অন্ধ ভিখারী কিম্বা সন্ন্যাসীকে মেকি পয়সা দান ক'রে ধর্ম্মকে ফাঁকি দেয়নি নিশ্চয়ই, তাঁরা যেমন

ফাঁকি দিয়েছেন সংসারীকে মেকি বুলি বিলিয়ে।" অশোকের পরেই এই মন্তব্য ক'রে বসে তিতু।

—"জগতের সর্ব্ব জীব-গুণের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি। সাপের খলতা, ব্যাঘ্রের হিংস্রতা, কুকুরের সংযম, সিংহের সাহস, সারসের আত্মীয় প্রীতি, মৌমাছির একতা, ছাগের কাম, গৃধ্রের পৈশাচিকতা প্রভৃতির সঙ্গে দধিচীর ত্যাগ, সমস্তই বিদ্যমান;— পশু আর দেব ভাবের এক আশ্চর্য্য বিকাশ। ঘৃণ্য গুণগুলোকে দাবিয়ে দেব-ভাবের চরম বিকাশই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য।

মনের কোণে যখন যে গুণের প্রভাব বিস্তার লাভ ঘটে আমরা তখনই ঝুঁকে পড়ি সেই দিকে।

বড়শীবিদ্ধ মাছের যন্ত্রনা কাতর ছুটোছুটি আমাদের প্রাণে বেদনার পরিবর্ত্তে উল্লাসেরই সৃষ্টি করে। মাছের ভাষা মানবের দুর্জ্জ্ঞেয়। আমাদেরই অপর ভক্ষ্য ছাগের গলায় ছুরি চালাতে গিয়ে তার যন্ত্রনা কাতরতায় আমরা কিছুটা বিচলিত হই বটে, কেননা, তার সে মৃত্যু কাতর 'ম্যা' 'ম্যা' ধ্বনি আমারই 'মা' 'মা' ডাকের স্মৃতি এনে দেয় মনের কোণে, আমার অজ্ঞাতে। কিন্তু, তবু কঙ্কাল ছড়ানো ছাগ-শবের সান্নিধ্য-বাস নির্জ্জন অন্ধকার রাত্রিতেও একক প্রাণে সঞ্চার করে না পৈশাচিক ভীতি। আর ভিক্ষুকের গলায় ছুরি চালাতে,— হাড়ি-ডোম-মুচির বুকে ছুরি বসিয়ে দিতেও হাত কাঁপে; বিচলিত হ'য়ে পড়ি তার মৃত্যু-করুণ আর্ত্তনাদে। তার ভাষা যে আমার বড়ই পরিচিত। তার রক্তকণা যে আমর রক্তকণারই অনুরূপ। আমার শেষ পরিণাম দিনটিও যে তেমনি বেদনা দায়ক। তাই মনের

কোনায় অজ্ঞাতে একযোগে এসে দাঁড়ায় সমস্ত সে স্মৃতি। তাই তো, মহাশ্মশানে নর-কঙ্কাল ছড়ানো শবের মাঝে অসহায় একাকী আমি কেঁদে উঠি আতঙ্কে। স্বীয় পরিণাম অজ্ঞাতে এনে দেয় প্রাণে ভীতি।

সুতরাং, ভিক্ষুকের পরিণাম ও অজ্ঞাতে মনের প্রান্তে সেই স্মৃতিরই খোঁচা মারে। সেখানে প্রতারণার অর্থ, আত্মপ্রতারণা। মানুষ তা পারে না। যে পারে, অসাধ্য অপকর্ম্ম তার কিছু নেই এ জগতে।

আর ধর্ম্মকে আমরা বেশী শ্রদ্ধা করি, সে শুধু স্বার্থের খাতিরে। ভগবানকে দয়াময় বলি, তিনি আমার কোন অভাব রাখেননি ব'লে। প্রার্থনা জানাই, পূজা করি, পাপ ক'রেও না যাতে তার ফল ভোগ ক'রতে হয় তারই জন্য। কিন্তু, যখন শিখি ভগবান ব'লে কেউ নেই, আমার দানের প্রতিদান চতুর্গুণ হ'য়ে ফিরে আসছে না সুদে আসলে পরকালে, তখনই আসল বিনাশের আতঙ্কে আমরা হ'য়ে পড়ি চার্ব্বাক ;—আর বলি,—

"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"
—দানং কৃত্বা সুখী ভবেৎ নয়।

কিন্তু, সে তো নয়। বীরের ন্যায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে যে ব'লতে পারে, আমার পাপের শাস্তিটুকু আমায় দ'ও প্রভু। তোমার যা কিছু দানের জন্য আমার পূজা নয়, আমার শ্রদ্ধা তোমার সমদর্শিতায়। আমার অন্তরে চাই সেই মহত্বের কণামাত্রের বিকাশ। তাই আমার প্রার্থনা, তাই আমার পূজা, তাই আমার

দেবতা প্রতিষ্ঠা। এবং, এই হ'চ্ছে মনুষ্যত্ব, পূর্ণ সাধনা। এ ছাড়া যে সাধনা, সে সাধনাই নয়; আশ্রমে ও সংসারেরই ভণ্ডামি মাত্র।

—"কিন্তু, ঐ সাধুর পোষাক প'রে ধোকার বাণী ছড়িয়েই তো আজ এনেছে এই অবিশ্বাস, এই অশান্তি।"—অভিমত জানায় তিতু।

—"আর সেই ধর্ম্মবাণী প্রচারণার চোটে আজ যে অশান্তির ঢেউ খেলছে তা ঠেঙ্গাতে গিয়ে রাজশক্তিও অস্থির। অথচ, এই ক'রে ক'রে অশ্রমবাসীর বিরাট দল দেশকে উচ্ছন্নে দিয়েছে, অপরের গলগ্রহ হ'য়ে হ'য়ে। আজও তাই দিচ্ছে।"—যেন অমলকে উদ্দেশ ক'রেই কথাগুলো বেরিয়ে আসে অশোকের মুখ থেকে। সঙ্কোচ বোধ ক'রে তিতু।

—"জার্ম্মানী থেকে একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ব'লেছেন,—"জগতে যদি আজ এত না বেশী চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়তো, মানুষের মৃত্যু সংখ্যা অনেকটা কম হ'ত।''—আর, আমার মনে হয়, জগতে যদি না এত বেশী ধর্ম্মের বাণী ছড়ানো হ'ত তবে অশান্তির স্রোত সম্ভবতঃ অনেকটা কমই ব'য়ে যেত।

সমস্ত ধর্ম্ম প্রচারকেরই লক্ষ্য শান্তি;—মূল অহিংসা। কিন্তু, তথাপি, সেই প্রচারকদের অনুগামী শিষ্যেরা খৃষ্টান ইহুদী, হিন্দু—মুসলমান, শাক্ত বৈষ্ণব সবাই মিলে চালছে হানা হানি ক'রে,—সবাই অহিংসা আর শান্তির সাধক হ'য়েও। এর মূলে রয়েছে—কিছু না কিছু সংকীর্ণতা। বুঝবার অথবা বুঝাবার ভুল। আর

রাজশক্তি সেই সংকীর্ণতার সুযোগ নিয়ে বর্ত্তমানে চলেছে স্বার্থ-সিদ্ধির পথে।—ঠেঙ্গাতে অস্থির নয়।

তা ছাড়া, বর্ত্তমান যুগের রাজশক্তি তো আর রাজর্ষিক গুনকে আশ্রয় ক'রে নেই; সম্পূর্ণ তমোগুণে মগ্ন। অতি ইতর সাধারণের কাজ ক'রে চলেছে মাত্র। স্বৈরাচারী একক প্রভুত্বের স্থানে জগতে চলেছে দলীয় স্বৈরাচারের প্রভুত্ব।"

—"তা হলেও, জগতে এই রাজশক্তির প্রভাবেই মানুষ ধন-প্রাণ নিয়ে শান্তিতে বেঁচে আছে বটে, আজও।"—টিপ্পনি জানায় অশোক।

স্বাভাবিক ভাবেই ব'লে যায় অমল,—"রাজার শান্ত্রী প্রজার ধন-সম্পদ পাহারা দিয়ে দুষ্টের হাতে তার অপহরণ বিনাশ ক'রে শান্তি রক্ষা করেন,—একথা সত্য। সবলের কবল হ'তে রক্ষা করেন দুর্ব্বলের প্রাণ, লাঞ্ছিতের সম্মান।

কিন্তু, রাজার রাজ্য-সীমানার বাইরে,—শুধু, বাইরে বলছি কেন, ভিতরেও,—এমন কত শত পাহাড়-পর্ব্বত, বনাঞ্চল, পল্লীর নিভৃত কোণ বর্ত্তমান; রাজার শান্ত্রী যার সঙ্গে পরিচিতও নন্। কিন্তু, সেথায়ও এই দুর্ভিক্ষের তাড়নায় তিলে তিলে মানুষ ক'রেছে আত্মহত্যা, তবুও প্রাণ রক্ষার ব্যগ্রতায় বিন্দুমাত্র চেষ্টা পায় নাই. নির্জ্জন প্রান্তর কোণস্থিত শাক-পাতাটি পর্যন্ত আত্মসাতের, অতি অরক্ষিত অবস্থায়ও যাহা ফেলে রাখেন ক্ষেত্র-অধিস্বামী।"

—"কিন্তু, কেন?"—প্রশ্ন জানায় অশোক—

নারীর প্রশ্ন

—"মানুষ শিক্ষা লাভ ক'রেছে; যদিও রাজশক্তি কিম্বা লোক-চক্ষু তার সে পাপ প্রত্যক্ষ না করুক,—কিন্তু, এই পার্থিব রাজার উপরে যিনি বিশ্ব-রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত, যিনি সর্ব্বত্র দেখতে পান;—এই নশ্বর দেহান্তে,—লক্ষ লক্ষ পরস্বাপহরণ দ্বারায় ও যার চিররক্ষা সম্ভব নয়, তারই ক্ষনিক রক্ষার্থে সে যে পাপানুষ্ঠান করবে ক্ষণ পরে সেই সর্ব্বদর্শীর বিচারালয়ে কি ক'রে মুক্তি পাবে সে! —এই জ্ঞান, এই শিক্ষা তাকে সংযত করে মহাপাপ থেকে। আর এই শিক্ষা প্রচার করে বনে-জঙ্গলে পাহাড়-পর্ব্বতে, নির্জ্জন কান্তারে, একান্ত অসহায় পরিস্থিতিতে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেন ধর্ম্মের বাণী ছাড়িয়ে ওই অপরের গলগ্রহ মানুষগুলি;—সন্ন্যাসী, ঋষি।"

—"সর্ব্ববিচারক ভগবান ব'লে কি সত্যই কেহ আছেন; মৃত্যুর পরেও কি পাপ পুণ্যের বিচার হয় তাঁর বিচারালয়ে?" —জানবার আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন জানান শ্রীমতী সেন।

—"নাই বা থাকলো সেরূপ ভগবান, নাই বা থাকলো তাঁর বিচারালয়; —যদিই বা হয় সে অলীক কল্পনা মাত্র,—কিন্তু, যে কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে যে শিক্ষা বিস্তার ক'রে অনায়াসে জগতে কল্যাণ স্থাপনা সহজ হয়, তা মিথ্যা কল্পনা মাত্র হ'লেও কু-শিক্ষা নয়; ঘৃণ্য নয়। যুগে যুগে কত চণ্ডাশোক সেই কল্পনার স্তবকে স্মরণ মাত্রে রূপান্তরিত হয়েছেন মহাত্মা ধর্ম্মাশোক রূপে,—দস্যু রত্নাকর হয়েছেন মহর্ষি বাল্মীকি!

কিন্তু, রাজ্য শাসনের গুণে কোনও 'জগাই মাধাই' আজও লাভ ক'রে নাই পরম বৈষ্ণবত্ব। মানব সমাজ ঐ শিক্ষা লাভ করে' তার পরিবর্ত্তে আশ্রমকে দিয়ে এসেছে মুষ্টি ভিক্ষা, আর রাজাকে,— শ্রদ্ধা বিজড়িত রাজকর।"

অমলের শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি আর সরল আশ্রমোক্তি শ্রীমতী মলিনার প্রাণে জাগিয়ে তোলে সেই পরম-পুরুষে অনন্ত বিশ্বাস। মনে মনে মাথা নত করেন তাঁরই শ্রীচরণে।

জল খাবার আয়োজন হ'তেই, আপাততঃ থেমে যায় এ আলোচনা প্রসঙ্গ এইখানেই।

—(*)—

সতের

নীলিমা এসেছে; তার শহুরে চাল-চলন পাড়াগাঁয়ে এসে আরও একটু মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে, চন্দনগড়ের চোখে তার বৈশিষ্টকে একটা আদর্শ দেখানোর গৌরবে।

রায়বাড়ী এসে অবধি কোন কিছুতেই অতৃপ্তি বোধ করছে না সে; শহর আর গ্রামকে একসঙ্গেই ভোগ করা চলে। তা ছাড়া, রায় বাড়ীর আড়ম্বরটুকুও তার প্রাণে আনন্দ জোগায়।

নারীর প্রশ্ন

গৌরিশঙ্কর আশ্রমের জনাকয়েক কর্ম্মী আর কিছু সাহায্য নিয়ে প্লাবণের দেশে ছুটে গেছেন চট্টগ্রামে। শ্রীমতী মলিনা সেনও কিঞ্চিৎ সাহায্য এবং কর্ম্মী পাঠিয়েছেন সেই সাথে,– বাহিনীর পক্ষ থেকে।

নীলিমা একদিন গৌরিশঙ্করের সাইকেলটা নিয়ে একটা চক্কর দিয়ে এল সমস্তটা রায়বাড়ীর চতুর্দ্দিকে। পল্লীর মেয়েরা বিস্ময় বোধ করে দেখে;—অশোক তারিফ করে তার বাহাদুরীর।

নীলিমাকে বড়ই ভাল লাগে অশোকের। "আশৈশব একসঙ্গে খেলা-ধূলো ক'রে রাজভক্ত প্রজার মতই তিতুর প্রতিটি আদেশ-নির্দ্দেশ পালন ক'রে, এত কাছে থেকেও একমাত্র শৈশবের সহচরী ভিন্ন আর কোন পরিচয় আজ পর্য্যন্তও খুঁজে পায়নি সে,—তার ভিতরে। অশোকের বাহাদুরীকে, কর্ম্মকুশলতাকে অপর দশজনা যেথায় প্রশংসা দান ক'রে, সেখানেও যেন উদাসিনী সে।

আর, এই নীলিমা; দু'দিনেই চিনে নিয়েছে অশোকের কর্ম্মদক্ষতাকে,– শিক্ষাকে। প্রশংসা করে তার রীতি-নীতির, মূল্য দিতে জানে তার সব-কিছুর। নীলিমার পক্ষে যে তা স্বাভাবিক! শহরে আধুনিক শিক্ষায় গ'ড়ে উঠেছে সে;- শিক্ষা এবং সভ্যতা তার পরিচিত।

তিতু ও লেখা-পড়া জানে, সুন্দরী; কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সংস্কার ত্যাগ করতে পারেনি, উন্নত সভ্যতায় সাড়া দেয় না তার অন্তর। পরীক্ষায় কয়েকটা বেশী 'নম্বর' পাওয়াটাই মস্ত একটা কিছু নয়।"
– অশোক আপন মনে বিচার করে এই সব তথ্যের।

নারীর প্রশ্ন

তিতুর কাছে নীলিমার রূপের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ না পেলেও নীলিমার চঞ্চল দৃষ্টিতে প্রাণে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করে, অশোক তাকে উপেক্ষা তো করতেই পারে না, বরং নূতন জীবনের সাড়া পায় নিবিড় আনন্দে। তিতুর সৌন্দর্য্যকে সে পূজা করেছে, শ্রদ্ধা করে এসেছে। মূক পূজারীর মত সে যেন শুধু পূজাই ক'রে আসছিল,—অন্তরের আবেগকে শ্রদ্ধার শাসনে শঙ্কিত রেখে। আর সেই পূজার,—সাধনার প্রাণময়ী বরদাত্রীরূপে দেখা দিল নীলিমা। আজীবন মূক সাধনার সিদ্ধি-শিহরণে পুলকিত তার সমগ্র দেহ মন।

রিনি নীলিমার কাছে আসে; আপন মনে আলোচনা করে তার জীবন ভঙ্গীর। কথা বার্ত্তা আলাপ-আলোচনাও হয় দু'জনে।

সেদিন সকালের দিকটায় রিনি এসেছে; একটু পরেই সেখানে দেখা দেয় অশোক। এবং, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নীলিমার ঘরখানিতে ঢুকিয়া পড়ে তিতু। প্রথমেই চোখে পড়ে রিনি; মুখে হাসি ফুটিয়ে ব'লে তিতু;—

—"বাঃ; নীলুদির সঙ্গে রিনির বেশ ভাব জমে গেছে দেখছি! ও এখন আগেই আসে এখানে।"

—"কেন, হিংসে হয় নাকি আপনার?"—ঠোঁটে হাসি এনে জানায় নীলিমা।—"অশোক বাবুর ও প্রায় সেই দুর্দ্দশা।"—ব'লেই অশোকের পানে তাকায় দুষ্টু কটাক্ষে, একান্ত পরিচিতের মতই।

—নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ করে অশোক, হিমসিম্ খেয়ে যেন লাল হ'য়ে ওঠে তার সমগ্র মুখখানা!

নারীর প্রশ্ন

অবস্থার মোড়টা ফিরিয়ে দিয়ে জানায় তিতু, "আজ আর কলেজে যাব না আমি নীলুদি; শরীরটা খারাপ লাগছে বড়। জানাবে মাসিমাকে বুঝলে?"—

ব'লেই সেখান থেকে বাইরে চলে যায় তিতু;—পরিবেশ ভাল না লাগতেই রিনিও তিতুর অনুগমন করে তখনই। তারপরে, কিছুটা সময় কাটে নীরবতার ভিতরে,— আর, সেই নীরবতা ভেঙ্গে প্রস্তাব জানায় নীলিমা,—

—"আজ তবে আমরা দু'জন একসঙ্গে যাব রিকসতে, কেমন; তিতুদি আর আপনি যেমন যেতেন?"

উত্তরে কিছুই বলতে পারে না অশোক। মন্ত্রমুগ্ধের মতই যেন রাজী হয় সে প্রস্তাবে; এবং, এইরূপ স্থির হ'তেই উঠে পড়ে নীলিমা,— চলে যায় অশোক।

* * *

রিকস চলেছে কলেজের পথে অশোক আর নীলিমাকে বুকে ক'রে।

যতই কেননা আধুনিকতার চেষ্টা করুক, পাড়াগাঁয়ের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি অশোক। নগ্ন সভ্যতাকে প্রাণ-খুলে আলিঙ্গন করতে পারে না আজও। তাই তার সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল;—নীলিমা নবাগতা,—অনাত্মীয়া। পাড়াগাঁয়ের পরিচিত চোখের বক্রদৃষ্টির আশঙ্কায় চিত্তে তার দুর্ব্বলতার সংশয়।

নীলিমা কিন্তু সভ্য শিক্ষায় শহরে শিক্ষিত হ'য়ে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ জ্ঞানের সংকীর্ণতা মুক্তি লাভ ক'রেছিল। সুতরাং, অপরিচিত

নারীর প্রশ্ন

পুরুষের গা ঠেসে গাড়ীতে ব'সে যাওয়া, কিম্বা গায়ে ধাক্কা-ধাক্কি ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হওয়ায় কোন প্রকার সংস্কোচ মনে স্থান দেয় নাই।

পাশা-পাশি বসেছে দু'জন,—রিকস-ওয়ালা গাড়ী চালিয়ে চলেছে সবটুকু জোর দিয়ে,—অবিরাম গতিতে। আর অশোকের হৃদ্-পিণ্ডের গতিবেগও যেন চলেছে একটু দ্রুততালে, চেনা মুখের বক্রদৃষ্টি কাটিয়ে।

তিতুর পাশে ব'সে এম্নিভাবে কতদিন চলেছে সে; কিন্তু, আজ নূতন সাথীর সঙ্গে চলায় কি এক অজানা চঞ্চল প্রেরণার উন্মাদনা! হৃদয়ের গতি ক্ষণেই ছন্দহীন, কিন্তু মিষ্টি!

নীলিমার পানে চাইতেই,—সেই দুষ্টু হাসি। আর, সেই হাসির শেষেই জানায় নীলিমা,—"কষ্ট হচ্ছে আপনার, বড্ড চেপে বসেছি বুঝি?"

—"কই, না! বরং, আপনারই অসুবিধে হচ্ছে দেখছি।"—বিনয় মিশ্রিত জবাব দিয়ে একটু স'রে বসতে চেষ্টা করে অশোক।

কিঞ্চিৎ চাপা কণ্ঠে,—"আপনি নয়,—তুমি।"—কিছুটা অনুশাসনের সুরে এইটুকু শুধু উচ্চারণ ক'রেই নীলিমা চায় ঈষৎ আড়চোখে। তারপরেই, সেই দুষ্টু হাসি হেসে মুখ ফিরায়।

অশোক একটু বিব্রত বোধ করতেই বাইরের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে যেন স্বাভাবিক ভাবেই বলে নীলিমা,—"আপনি আমার চাইতে বড়,—'সিনিয়র'; আমাকে আপনি সম্বোধন করার কি দরকার!"

নারীর প্রশ্ন

অশোক চিন্তা করে,—"প্রথম আলাপ পরিচয় শেষ হ'য়ে গেছে কতদিন! কিন্তু,—এ সৌজন্য আজ, এ রাস্তায়!" হৃদয়ের কম্পন তার দ্রুততর হয় যেন অজ্ঞাত অপরাধের শঙ্কা-জড়িত আনন্দে। চুপ ক'রেই বসে থাকে সে।

আবার ব'লে চলে নীলিমা,- "তিতুদি তো আপনাকে ভালবাসে খুব ;—একেবারে নিজের মত।"

তেম্নি নীরবেই ব'সে থাকে অশোক। কোন কিছু জবাব দিবার পুর্ব্বেই আবার বলে নীলিমা,—"ওদের বাড়ীর সবাই আপনাকে স্নেহ করেন! আর, আপনার দাবীও ওদের ওপরে কম নয়।" দু'জনায় আপনাদের ভালবাসা একেবারে জন্মথেকে গ'ড়ে উঠেছে।"

অশোক শুধুই ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে তাকায় নীলিমার মুখের পানে ; —কিছুই যেন বলবার ভাষা নাই তার মুখে। অশোক স্বভাবতঃই মুখর; কিন্তু, আজ যেন যাদুকরের সাম্নে সম্মোহিত হতভম্ব মূক জীব সে।

রিক্‌স-ওয়ালা গাড়ী চালিয়ে চলে তেম্নি ;—আর ঠিক সেই সময়ে উল্টোদিক থেকে গেয়ে, আসছিল অলস গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, ততোধিক অলস কণ্ঠে,—প্রাণখোলা আনন্দে,—

—"ঝারে (যারে) আমি ভালবাসিরে
(ও) তারে দেখলি হয় প্রাণ ঠাণ্ডা'
বুকের মাঝে শুইয়ে থাকে—
যেন জগন্নাথের পাণ্ডা॥
ঝারে আমি ভালবাসিরে।"

—(*)—

আঠার

সংসারানভিজ্ঞ গৌরিশঙ্কর বিরাট সংসারভার দারুণ ক্লেশদায়ক বোধ করছিলেন ; এবং পদে পদে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে বসলেন। দত্ত ছায়ার ন্যায় পাশে থেকে সে ত্রুটি সেরে নিচ্ছিলেন।

নৃসিংহ রায়ের শ্রাদ্ধ বাসরে কাতর হ'য়ে দু'ফোটা চোখের জল ফেলেছিলেন মদন দত্ত ; এবং, তারপর উদ্যোগী হ'য়ে কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করলেন। শ্রাদ্ধের সপ্ত দিবস পূর্ব্ব হ'তেই দত্ত আর স্ব-গৃহে ফিরে স্নানাহারের সময় ক'রে উঠতে পারলেন না,—দু'দিন পূর্ব্বে গৃহিণী এসে ভাঁড়ারের চাবি গ্রহণ করলেন ;- গৃহে অরন্ধণ হেতু অশোককেও পিতামাতার অনুগমণ করতে হ'ল।—সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা এম্নি ভাবে ঘুলিয়ে তোলেন মদন দত্ত।

তৎপরে, সুযোগমত একদিন গৌরিশঙ্করকে দত্ত বুঝিয়েছিলেন যে, এতকাল সন্ন্যাস পালনান্তে এখন দার পরিগ্রহ একদিকে যেমন নিন্দনীয় অপরদিকে সন্ন্যাস ধর্ম্মেরও অবমাননা! ইহাপেক্ষা তিতুকে একটি সৎ-পাত্রে সমর্পণ পূর্ব্বক গৃহে রাখার যে পরিকল্পনা উহাই সুযৌক্তিক। অমলকৃষ্ণ সম্বন্ধে কাকিমা ছোট-বৌ-মাকে যে অভিমত জানিয়েছেন,—অমল ছেলে মন্দ নয়। তার আত্মীয়-বন্ধু বা সংসার বলতেও সম্ভবতঃ কিছু নাই। ঘর-জামাতার পক্ষে এরূপ ছেলেই ভাল। কিন্তু, আমি বলি কি না ভাই, যে ছেলে নিজে স্বেচ্ছায় আত্মীয়-স্বজন, সংসার পরিত্যাগ ক'রে— আশ্রম নিয়েছে সে শিবতুল্য লোক। সে যে পুনরায় সংসার বন্ধনে আবদ্ধ

হ'বেন, তেমন ধারণা কিন্তু ভাই আমার নাই। ধর পাকড় ক'রে বেঁধে দিলেও কবে হয়তো আবার বুদ্ধ শ্রীচৈতন্যের মতই একদিন পালিয়ে যাবেন স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে। হিন্দু ঘরের মেয়ে,—তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল দুই-ই যাবে।

তা ছাড়া, যে জনা স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, দয়া ক'রে ভগবান ধর্ম্মে যাকে সুমতি দিয়েছেন,—তাঁকে বেঁধে ধরে সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ করা মোটেই সমীচিন নয়। আমরা সংসারাবদ্ধ জীব, সংসারের মায়া মোহ কাটাতে পারছি না। আহা, তোমরা মুক্ত পুরুষ। তোমাদের যদি টেনে আমাদের পর্য্যায়ে নামিয়ে নেওয়া হয়, তবে আমাদের টেনে তোমাদের পর্য্যায়ে তুলবেন কে?"

দত্তের এবম্বিধ দার্শনিক উক্তির উত্তরে গৌরিশঙ্কর সেদিন আশাপ্রদ ইঙ্গিতই প্রকাশ করেছিলেন।—তিনি নিজে তো আর বিয়ে করবেনই না,—সে কখনও সম্ভব নয়। অমলকৃষ্ণ সম্বন্ধেও তিনি সেরূপ আশা পোষণ করেন না।—অতএব, সেদিন হ'তেই সদানন্দ চিত্তে দত্ত রায় সংসারের উন্নতি বিধানে মনঃসংযোগ করলেন।

দীর্ঘদিন সংসারে কাটিয়ে গৌরিশঙ্কর হাঁপিয়ে উঠলেন।—তাই, এহেন দত্তদাদার উপরে সংসার ভার রেখে এবং অমলকে পরমাত্মীয় জেনে নিশ্চিন্তমনে কয়েকটা দিন আবার বেরিয়ে পড়লেন, তীর্থ-পর্য্যটন মানসে!

ইহারই কিছুকাল পরে একদিন স্বামীর পরামর্শ শিরে ধরে, প্রজাপতির বার্ত্তা নিয়ে দত্ত-গৃহিনী আবির্ভূতা হলেন রায় বাড়ীতে,

নারীর প্রশ্ন

--নিরিবিলি এক পড়ন্ত বেলায়। কাশীদাসি মহাভারতখানি খুলে সবে বসেছেন বড় বৌ, সুর যোজনা হয়নি তখনও।

এসেই প্রশ্ন জানায় দত্ত গৃহিনী, "বলি, ও বড়দি! মেজ ঠাকুরপো এলেন কি ?

—"কই, না তো! কোন চিঠি পত্র এসেছে কি"—বিস্মিতের-ভাবে প্রতিপ্রশ্ন জানান বড় বৌ।

- "না গো না! বড়ই দুশ্চিন্তা হচ্ছে,—তীর্থে গেলেন তো ঐ চন্দ্রনাথে, আবার সেখান থেকে আসামে। একস্থানে দাঙ্গা, আর একস্থানে বাঙ্গাল খেদা।' কী অঘটনটাই না ঘ'টে বসে শেষে!"—দুশ্চিন্তার ভাণে বিজ্ঞার ন্যায় মন্তব্য প্রকাশ করেন দত্ত-গিন্নী।

—"দুশ্চিন্তা আর বাড়িয়ে দিও না তুমি, না গো না! তাই তো! ভাবচি শেষ পর্য্যন্ত অদৃষ্টে কি না হয়।"—দুর্ভাবনায় মুখখানা ছেয়ে যায় বড়-বৌয়ের।

—"সত্যই দিদি, আমি সেই কথাই ভাবি! বড় কর্ত্তার নামে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত।" ছোট-ঠাকুর পো মানুষ তো নয়, যেন মর্ত্ত্যে এসেছিল দেবতা; তেমনটি কি আর মিলে। কিন্তু, যা-ই বল দিদি, ছেলে-পিলে এক একজন গণ্ডে পা দিয়ে আসে। এই ত্যাখই না,—তিতু মায়ের পেটে এল, আর অমন দেবতার মতন বাপকে খেয়ে বসলো মাটিতে পা না দিতেই। জ্যাঠামশাই কত স্নেহ-সোহাগ ক'রে বড়টি করলেন, বাপের অভাব বুঝতে দেননি একটি দিনও। লেখা পড়া শেখালেন; কত আশা,

—আনন্দ ক'রে ছোট মেয়ের বিয়ে দেবেন। কিন্তু, সেও আর হ'ল না। বুড়ো ঠাকুরমার শেষ ইচ্ছা, ছোট-ঠাকুরপোর মৃত্যু দিয়ে পাওয়া এই শেষ চিহ্ন,—ছোট নাতনিটির বিয়ে দেখে চক্ষু দু'টি বোজেন। কিন্তু, সেটিও বুঝি বা ওর ভাগ্যে নেই।—মেজ-ঠাকুর-পো শিবতুল্য লোক;—আতুড় ঘরে ওকে দেখে বলেছিলেন,- সাক্ষাৎ উমা! রূপে তো উমাই বটে; কিন্তু, রাগ করোনা দিদি,- এ যেন রূপকথার সুন্দরী ডাইনী। মেজ ঠাকুর-পো শুধু ওর মুখ চেয়েই তো ঘর নিলেন। তা ছাখই না, বিদেশ বিপাকে আবার কিসে কী না হয়ে বসে ওর কপালে।" এতগুলো কথা নানা ভঙ্গী ও সুর সংযোগে বড় বৌয়ের কর্ণ কুহরে বর্ষণ ক'রে একটা সমর্থন সূচক ইঙ্গিতের আশায় চাইলেন দত্ত গৃহিণী বড় বৌএর মুখের পানে।

কোন প্রকার উচ্চবাচ্য না ক'রে মহাকাব্যের পাতা উলটিয়ে চলেছেন তিনি, উদ্দেশ্যহীন ভাবেই যেন। ও ঘরে থেকে তিতু শুনছিল সবই; সে যে আজ কলেজে যায়নি দত্ত গৃহিণী জানেন না তাহা। – তাই, তার বাক্যগাঁথা সুরু হ'ল আবার,—

- "কাকিমার কিন্তু বড় ইচ্ছা অশোক আর তিতুর হাত দু টি এক ক'রে দিয়ে যান। বড় কর্ত্তারও সেই ইচ্ছাই ছিল। ওঁরা তো অশোককে একেবারে নিজের ছেলের মতই দেখেন; তাই চেয়েছিলেন একেবারে আপনার ক রে নিতে।

সত্য কথা বলতে কি দিদি,—আমাদের তো ওই 'এক কানাই'। —তাই তিনিও মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস করেননি কোন দিন। আমাদের কর্ত্তা কিন্তু সবই টের পেতেন আকার-ইঙ্গিতে। আর

এখন কি না, ওরই সায়ে এই রায়বংশের সুনাম সমস্ত মাটি হ'য়ে যাবে ;—কে একজন ঘরছাড়া এসে সব ডুবিয়ে দেবে ? সে কি আর উনিই দেখতে পারেন ? এই রায়বংশ আর দত্তবংশ কিছু ছাড়াছাড়িও তো নয়। অশোককে আমি না হয় পেটেই ধরেছি, তাই ব'লে তোমাদের স্নেহের দাবিও কি কম ? আমার ছেলে তোমাদেরও কেউ নয় কি ?—ব'লেই বড় বৌয়ের পানে তাকান একটা সহানুভূতির আশায়।

বড় বৌ এবার একটু মৃদু হেসে যেন প্রকাশ করেন অশোকের প্রতি স্নেহের অনুভূতি,—মাথাটি ইষৎ দুলিয়ে।—আর সেই সঙ্গে পুনরায় আরম্ভ হয় কথকতা। তার এ 'সপ্তকাণ্ড' শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত 'মহাভারত কথা' সুরু হ'তেও পারে না যে।—"আচ্ছা; আমাদের কর্ত্তা তাই বলেন কি যে, কাকিমার যেরূপ অবস্থা তাতে শিগ্‌গির ক'রে ভালোয় ভালোয় মেজ-ঠাকুর-পো ফিরে এলেই শুভকাজটা সেরে ফেলেন।

তার পরে, পাড়ার লোকে ওকে রাক্ষুসী, অলক্ষুণে কত কি বলে। সে বলুক ; অশোকের আমার ঠিকুজী বড় ভাল। লক্ষণও সব সুলক্ষণ। ছেলের রাশি-চক্রের ফেরেই ওর যতসব অলক্ষণ কেটে যাবে।—তারপরে এই পাশটা করলেই একেবারে থানার দারোগা হ'য়ে বেরুবে। আজকাল তাদের যা পয়সা! দাদা তো রাজার হালে বসেছেন এই ক'বছরে।—এখন তোমাদের পাকা কথাটা পেলেই আমরা প্রস্তুত হ'তে পারি। হাজার হোক, ছেলে তো ; অশোকের মতটাও জানতে হ'বে বৈ কি।"

নারীর প্রশ্ন

দত্ত-গৃহিণী এবার যখন শেষ সদুত্তরটি শ্রবণের আশায় উৎকণ্ঠান্বিতা তখনই ও ঘর থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালো তিতু; এবং সেখানে দাঁড়িয়েই ব'লে চললো দত্তগিন্নীর উদ্দেশে,—"আপনি তো জানেন জ্যাঠাইমা, আমি অলক্ষুণে। আমার দুরদৃষ্টকে অন্যের সৌভাগ্য দিয়ে গৌরবান্বিত ক'রে তুলতেও চাই না আমি। নিজের জন্মান্তরের অভিশাপ নিজেই ভোগ করবো। আর এটাও বোধ হয় জানেন,—যদি—না-ই জানেন তবে জেনে রাখুন আজ থেকে যে, জীবনে বিয়ে আমি করবো না কোন দিনই। আপনাদের ধারনা মন থেকে মুছে দিয়ে সুলক্ষুণে কোন মেয়ের চেষ্টা দেখুন;—সুখী হ'তে পারবেন। নইলে মিথ্যা একটা আশা পুষে রেখে শেষ পর্য্যন্ত প্রতারিতই হবেন শুধু।"—কথাগুলি শেষ ক'রে অকস্মাৎ ঘরে ঢুকে যায় তেম্নি।

গুরুজনের সাথে জীবনে এমন ভাবে কখনও কথা বলে নাই তিতু;—বিশেষ ক'রে নিজের সম্বন্ধে। আজীবন শুধু সহ্য ক'রেই এসেছে, আজ আর পারে না সে। তাই, অকস্মাৎ গুরুজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বসলো এই বিয়ের প্রস্তাবে।

মা এসে ততক্ষণ দাঁড়িয়েছেন জ্যাঠাইমার বারান্দায়,—সবাই নির্ব্বাক। দত্ত-গৃহিণী বড়ই অসহায় বোধ করলেন এই নিরুপায় অবস্থায়। অবশেষে ক্ষুন্নমনে এইটুকু শুধু বল্লেন,—"যাক্ বাছা;—বিয়ে না কর,—সে আজকাল লেখা পড়া শিখে অনেক মেয়েই তো আইবুড়ো থাকছে। কিন্তু, আমাদের 'গরীবের ঘোড়া রোগটাই' যে মস্ত একটা ভুল, সে টি উনি বুঝতে চান না।"

কিঞ্চিৎ থেমে নিরাশার ছোট্ট একটি দম গ্রহণ ক'রে এবার জানান ছোট বৌয়ের উদ্দেশে ;—"তা, যাই ছোট বৌ। একলা মানুষের কোথাও কি আর ছাই দু'দণ্ড দাঁড়াবার জো' আছে ?"

নিরুপায়ের মধ্যে একটা উপায় ক'রে নিয়ে এখানেই বিদায় নিলেন তিনি।

—(*)—

উনিশ

রেনুকা, ওরফে রিনি বড়ই স্পষ্টবাদিনী। ধনী তারা নয়, ধনের গৌরবও তাদের নেই। কতকগুলি সভ্য খাদ্য পানীয় তারা খায় না, সভ্যতার ক্ষৌরকার্য্যে ছেটে-চেঁচে স্বাস্থ্য তাদের লিক্‌লিকে সভ্য হ'য়ে ওঠেনি। ধুলো-কাদার সঙ্গে মাখামাখি ক'রে নদীর মাছ, বাড়ীর গাই এর দুধ, তরি-তরকারী আর টাটকা চা'লের ভাত হজম ক'রে স্বাস্থ্য বা শক্তিতে তারা নিঃস্ব নয়। দরিদ্র তারা সভ্য-জগতের ব্যাঙ্কের হিসাবে। সরল আচার ব্যবহারেরও অভাব তাদের নেই। পিতা তার গ্রাম্য কবিরাজ, ভদ্র গৃহস্থ, মধ্যবিত্ত বলা চলে না।

শৈশবের এই সাথীটিকে তিতু নিজে এবং বাড়ীর আর সকলেই স্নেহ করেন। কিছুটা সাহায্যও যখন তখন রিনিদের সংসারটিকে

নারীর প্রশ্ন

এঁরা দেন,—দয়ার দান হিসাবে নয়, ঝরণার জল যেমন স্বভাবতঃই উপচিয়ে পড়ে পার্শ্ববর্ত্তী বস্তু সমূহের উপরে,——অযাচিত, অবিরত ধারায়।

রিনি জন্মাবধি এরূপ ধারা দেখে আসছে ব'লে সে সম্পর্কে কোনই সঙ্কোচের প্রশ্ন আসে না মনে। বিশেষতঃ, সে প্রশ্ন জেগে উঠবার সুযোগ দেয় না,—পাতানো হলেও পল্লীর সরল আত্মীয়তার মাখামাখি। — আর, পার্শ্ববর্ত্তী ব'লেই এই মাখামাখি অ'ত ঘনিষ্ঠ, এবং দাবীর সৃষ্টি ক'রে বসেছে।

চন্দনগড় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমলকৃষ্ণের একজন প্রিয় ছাত্রী এই রেনুকা।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরবার পথে রিণি আগেই আসে তিতুর খোঁজ নিতে। সন্তর্পনে ঘরে ঢুকে ডাকে সে,—"তিতু দি!"

—"রিণি? আয়!"— চিন্তার ভাবটা কাটিয়ে সস্নেহে ডাকে তিতু।

ক্ষণপূর্ব্বে দত্ত গৃহিণীর মুখের উপরে কথাগুলি ব'লে এসে একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে পড়েছিল সে। অসুস্থতার উপরে এই অবস্থাটা বড়ই পীড়া দিচ্ছিল তাকে।

—"কেমন আছ এ বেলাটা?" দরদ মাখানো সুরে প্রশ্ন আসে রিণির তরফ থেকে।

—"অনেকটা ভাল রে,—বোস্!" ব'লে ভাবটা সম্পূর্ণ কাটিয়ে নিতে চায় তিতু। এবং, পরিবেশটা পালটিয়ে দিতেই যেন শুধু, প্রশ্ন জানায় রিণিকে,—

নারীর প্রশ্ন

—"তোদের নূতন মাষ্টার মশাই নাকি খুব ভালবাসেন তোকে ?"

—"কেবল আমাকে নয়, স্কুলের সমস্ত ছাত্র ছাত্রিদের প্রতি তার অপরিসীম স্নেহ। গরীব ছেলে মেয়েদের ওপর তার কত মমতা! মাইনের প্রায় সব টাকাটাই তিনি দিয়ে দেন তাদের, স্নেহ আর আদরের ভিতর দিয়ে। গরীবের ব্যথা বুঝতে তিনি পারেন, নিজেও গরীবের ছেলে বলেই।"—রিণি জেনেছে, আশ্রমবাসী অনাথ বালকই অমলকৃষ্ণের পরিচয়।

—"ধনীরা তেমন পারে না, নয় কিরে ?"—উত্তরে যেন একটা ব্যঙ্গ মিশ্রিত বেদনার রেশ প্রকাশ পায় তিতুর।

বিস্মিত হয়ে রিণি তার মুখপানে চাইতেই লজ্জা অনুভব করে সে; একি ভাব প্রকাশ করে চলেছে আজ সে!—ব্যথিত হয়ে নরম স্বরে বলে রিণি,

—"জানি তিতুদি, এ তোমার প্রাণের কথা নয়। আমার কথাটার একটা পাল্টা জবাব দিতেই শুধু উচ্চারণ করে ফেলেছ মুখ। কিন্তু, এর উত্তর যদি সত্যিই দিতে হয় আমাকে তবে বলবো,—ধনীর যে মনের অনুভূতি সে শুধু ছায়াচিত্রের ছাপ মাত্র। ছায়াচিত্রের বাঘ গর্জ্জন করে লাফ দেয়, শিকার ধরে। তবু, সে বাঘ দর্শকের কৌতুকই সৃষ্টি করে শুধু,—ব্যাঘ্র ভীতি নয়।

ধনীর গৃহে জন্মেও যারা দরিদ্রের দুঃখ অনুভব করতে পারেন, অন্ধকারময়ী অমানিশাতেও গৃহে ব'সে বসন্ত চাঁদিনীর সৌন্দর্য্য সুষমা উপভোগ করেন ;—মৃত্যু যন্ত্রনায় ভগবানের আহ্বান শুনতে পান যাঁরা,—তাঁরা সূত্রের বাইরে. নিপাতনে সিদ্ধ।"

নারীর প্রশ্ন

তিতু শৈশব থেকেই রিণিকে জানে, কিন্তু এখনকার কথাগুলো যেন তার একটু নূতন, যদিও সে মুখরা। তাই প্রশ্ন জানায় তিতু,—

—"এত কথা বলতে তুই কবে শিখলি রিণি ; এসব নূতন মাষ্টার মশাইর কাছে বুঝি ?"

ইতিমধ্যে সেথায় দীমু নিয়ে আসে দুইখানি চিঠি ; একখানি লিখেছেন গৌরিশঙ্কর মণিপুর হ'তে। চট্টগ্রামের প্লাবন কেন্দ্রে আশ্রম এবং নারী বাহিণীর সেবক-সেবিকাদের বিদায় দিয়ে ৺চন্দ্রনাথ দর্শনান্তে ৺কামাখ্যাধামে চলেছেন বদরপুর-লুমডিং পথে,—মণিপুর হ'য়ে। অপর খানি নীলিমার।

নীলিমাকে ডেকে চিঠিখানি দিয়ে দিতেই প্রশ্ন জানায় রিণি, "কোথায় আছেম এখন জ্যাঠামশাই ?"

"মণিপুরে,—যেথায় যুদ্ধ করেছেন আমাদের নেতাজী।" পত্রখানি পড়তে পড়তে জানায় তিতু।

রোমাঞ্চ জাগে রিণির শরীরে মনিপুরের নামে! এক নিমিষে মনের পাতায় ফুটে ওঠে কত যুগের স্মৃতি থেকে এই সেদিনের ইতিহাস। তারও ইচ্ছে হয় একবার ছুটে যায় মনিপুরে ঐ পরম তীর্থে।

- "কুরুক্ষেত্র বিজয়ী মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত হ'লেন এই মনিপুরে, বালক বভ্রুবাহনের হাতে ; আর, ভগবান নিজে এসে পুনর্জ্জীবিত ক'রে দিলেন তাঁর প্রিয় সখাকে। তারই বংশধর মনিপুররাজ পরাজয় বরণ করলেন ইংরেজের শঠতায় ;—ব্যথা বাজে

প্রাণে। আর, এ যুগের সব্যসাচী, বাঙ্গলার গৌরব, ভারতের উজ্জ্বল রত্ন নেতাজী এই মনিপুরে যে আঘাত হানলেন, সেই বিশ্ব বিজয়ী ইংরেজ স্তম্ভিত হয়ে গেল সে বীরত্ব প্রতাপে। আর,--দুর্ভাগা ভারত সে আহবানে সাড়া না দিয়ে, তাঁকে সঁপে দিল কালের করাল কবলে।

সেই মনিপুর পরম তীর্থ ভারতের পীঠস্থান। তাই জ্যাঠামশাই গেছেন তীর্থ সন্দর্শনে সেখানে।--ভক্তিতে রিণি মাথা নত করে মনিপুরের উদ্দেশে; --আর মিনতি জানায় সেই পরম পুরুষের পায়ে,

"হে ভগবান! একদিন তোমার পরম সখা ধনঞ্জয়কে তুমি পুনর্জ্জীবিত করেছিলে এইখানে,—আর তোমার এ যুগের ধনঞ্জয়কে কি তুমি ফিরিয়ে দিবে না প্রভু!"

- (*)—

বিশ

নীলিমা আর অশোক সবে ফিরেছে শহর থেকে। নীলিমা এসে জামা-কাপড় ছাড়তে না ছাড়তেই তিতু ডেকে পাঠায় তাকে। সে এসে তিতুর হাত থেকে নিয়ে যায় তার চিঠিখানা। রিণিও চ'লে যায় গৃহে।

নারীর প্রশ্ন

ছোটবোন লতিকা জানিয়েছে, "জামাইবাবু আজ তিন দিন হয় পরলোক গমন করেছেন, অকস্মাৎ 'ম্যালিগন্যান্ট' ম্যালেরিয়াতে।"

লতিকার লিপি পাঠ ক'রে প্রাণ তার সমস্ত সংস্কার, সমগ্র সংকীর্ণতা পায়ে ঠেলে মেতে ওঠে স্বাধীন জীবনের নবীন আনন্দে। সংকীর্ণতা আর সংস্কারকে পরাজিত ক'রে রেখেছিল সে অনেকদিন পূর্ব্বেই; তথাপি, তার যে ছায়াটুকু প্রেতাত্মার মতই তার পশ্চাতে ফিরছিল, মহেন্দ্রের প্রেতলোক প্রাপ্তি সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণতা সংস্কারের সে প্রেতাত্মাও নীলিমার অন্তর ছেড়ে পালিয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে সে।

সে যে বিবাহিতা, একথা যথাসম্ভব গোপন রেখেই চলেছে এখানে। পিতা তাকে পত্রাদি লেখেন না, যা কিছু সংবাদ লতিকার মারফতেই জানিতে পায় সে।

আজ অশোক যখন আসে, রাত্রিবেলায় এমন প্রাণখোলা স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে কথা-বার্ত্তা ব'লে চলে নীলিমা যে অশোক আত্মহারা না হ'য়ে পারে না মোটেই। "আজ পর্য্যন্ত যতটুকু জেনেছে সে, নীলিমা যে তার চাইতে অনেককিছু বেশী!"

সেই কলেজের পথ থেকে এ পর্য্যন্ত অনেককিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে অশোক, রহস্যের মতই। নীলিমাও আজ জানাতে চায় তাকে,—

—"ওগো! আমি আজ মুক্ত; আমার সকল বাঁধন টুটেছে আজ ফিরিয়ে পেয়েছি আমার বাঁধনহীনা নারী জীবন।"

অথচ কি ক'রে যে এল এই বাঁধনমুক্তি, ঠিক ঠিক জানাতেও পারছে না তা। কিন্তু বুঝাতে হবে তাকে, আজই এখনই;

নারীর প্রশ্ন

—দীর্ঘদিনের অসাড়তা, আজকের মুক্তি,—এইখানেই। যেন কত যুগের আবদ্ধ ঝরণা, সহসা পথ পেয়ে পূর্ণোচ্ছ্বাসে ছুটে বেরুচ্ছে সে!

কথায় কথায় রাত্রি কিছুটা বেড়ে উঠতেই নীলিমা একবার এলিয়ে শুয়ে পড়ে অবিন্যস্তভাবে বিছানায়;—কণ্ঠে তার চলতে থাকে একটা উচ্ছ্বসিত সঙ্গীতের মৃদু গুঞ্জনধ্বনি।

একখানি খোলা বই এর পাতায় চোখ রেখে অশোক তাহা শুনে যায় নিবিষ্ট মনে। সুরের ভিতর দিয়ে নীলিমা যেন বিলিয়ে দিতে চায় আপনাকে! আত্মদানের যে সুর বেজে উঠেছিল আজ প্রথম প্রভাত রাগিনীতে, দিনমানের নানা ছন্দে বেজে বেজে সে যেন পূর্ণাহুতি জানাতে চায় এই নিশার সাহানায়! সে সুরের মদিরায় অশোক যখন ডুবিয়ে দেয় আপনাকে,—সঙ্গীতের মিলিয়ে যাওয়া সেই রেশের সঙ্গে নীলিমাও যেন তন্দ্রায় জড়িয়ে পড়ে, সুরের সাথে মিলিয়ে।

অশোক অযথাই উল্টিয়ে যায় আরও খান কয়েক পাতা, কেটে যায় কিছুটা সময় নীরবে। বই থেকে চোখ দু'টো তুলে একটা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সে একবার চায় সুপ্তা নীলিমার পানে;—তার পরে দেখে নেয় সময়টা।

নীলিমার পানে চোখ রেখেই দাঁড়ায় উঠে; কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ ক'রে ডেকে দিবার সুরে ব'লে অশোক, "চলি এইবার; শুয়ে পড়ুন দরজাটায় খিলটা এটে; রাৎ হ'য়ে গেছে—অনেকটা।" ব'লেই প্রস্তুত হয় বেরুতে।

তন্দ্রার ঘোরেই যেন পাশ ফিরতে ফিরতে জানায় নীলিমা,—

—"এটে দিন আপনি।"

থমকে দাঁড়ায় অশোক। বুঝতে পারে না নীলিমার সে ইঙ্গিত ;— বোঝে, 'তন্দ্রার ঘোরে ঠিক উত্তর দিতে পারেনি সে।— তাই একটু পরিষ্কার কণ্ঠে জানায় এবার,—

"চল্লুম আমি ; দরজাটা ভেতর থেকে এটে দিয়ে শুয়ে পড়ুন, রাত্রি হ'য়ে গেছে অনেকটা।"— বলেই নীলিমার পানে আর একবার তেম্নি দৃষ্টি দানান্তে বেরিয়ে পড়ে সে।

ক্ষণপরে, নীরবে উঠে এসে বাইরের পানে অশোকের পশ্চাতে অনুসন্ধানের বৃথা একটা দৃষ্টি ফিরিয়ে সশব্দে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয় নীলিমা।— আর, পথে সে শব্দটা কানে পৌঁছুতেই আর একবার থমকে দাঁড়ায় অশোক ;— ফিরে তাকায় অন্ধকার রায় বাড়ীটার পানে।

গ্রামের চৌকিদার থমকে সুধায় তাকে,—"দত্ত বাবু বুঝি,— ফিরেছেন বাড়ীতে ?— চলুন।" সবে পাহারায় বেরুচ্ছিল সে।— অশোক গৃহে চলে তারই সাথে।

—(*)—

একুশ

নীলিমার প্রাণে স্বাধীনতার যে ঝড় ব'য়ে চলেছিল, তারই ঠেলায় ছুটে সে প্রশ্ন ক'রে বসে তিতুকে,

—"আচ্ছা তিতুদি! আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে বলে 'স্বামী নারীর পরম দেবতা।' পৃথিবীর সব দেশেই কি এই কথাই বলে? আর যে দেশে তা বলে না, সে দেশের নারীরা কি গড্ডালিকা প্রবাহের মতই নরকে প্রবেশ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করে সে মহাপাপের?"

যতই বিদ্রোহ থাকুক না প্রাণে আপাততঃ এরূপ প্রশ্নের জবাব দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না সে। তাই, বরং মুখে একটা হাসি টেনে নীলিমাকে পাল্টা প্রশ্ন জানায় তিতু।

- "এ চিন্তাটা হঠাৎ কেন মাথায় ঢুকলো নীলুদি?"

নিজেকে যথাসম্ভব গুছিয়ে বলে নীলিমা, "নারী হ'য়ে যখন জন্মেছি, যমের দরবারের এ ধারাগুলি জেনে রাখতে হয় বৈ কি?"

পাশে ছিল রিনি, সে যেন চমকে ওঠে নীলিমার এই উক্তিতে। 'স্বামীকে তবে কি মনে করে সে! নারীর সাজ সজ্জা, অলঙ্কার-পত্রের মতই কি শুধু ভোগ-লালসার, প্রবৃত্তির ইন্ধন মাত্র ব'লেই গ্রহণ করতে চায় সে? - স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে দেবভাবের পরিবর্ত্তে শুধু যদি পশু বোধই জাগ্রত হয়, তবে সে জ্ঞান যে সর্ব্বনাশা! সমাজকে জাহান্নামের পথ দেখাবার আর একটা সোজা রাস্তা মাত্র।

রিনি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, মা,-- দিদিমার কাছে যে শিক্ষালাভ করেছে এ যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই, সে সংস্কার মুক্ত হ'তে

না পেরে বক্র কটাক্ষ বর্ষণ করে নীলিমার প্রতি। জবাব দেয় রিনি,—

—"আমার কি মনে হয় নীলুদি,—অন্য দেশে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে অনুকরণ করবার পূর্ব্বে দেশ-কাল-পাত্র বুঝে অনুকরণ করাই শ্রেয়ঃ।

পশু মাত্রেই যৌন মিলনে সম্বন্ধ বিচারের অপেক্ষা মাত্র না রেখে, তাকে সম্ভোগ ব'লেই জানে শুধু। মানুষের ভিতরেও যাদের মধ্যে পশুভাব যত বেশী প্রবল,—যারা যত বেশী পশু জগতের নিকটবর্ত্তী,—সভ্যতার বড়াই করলেও যৌন সম্ভোগকে তারা ততটা বিচার বিহীন হয়েই ভোগ করতে চায়। কাচা মাংস, কাচা ডিম প্রভৃতি শরীরের পক্ষে উপকারী হ'লেও তা পশু কিম্বা আদিম মানুষেরই রুচিকর। কিন্তু,—যে জাতি সুদীর্ঘ দিনের সাধনায় আহার বিহারে পশুজ গণ্ডিকে অনেক পশ্চাতে ফেলে এসেছে,—যাদের মন-প্রাণ, নাড়ী-অন্ত্র প্রত্যেকটি শারীরিক যন্ত্র সু-সিদ্ধ, সু-চিন্তিত আহার-বিহারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাদের পক্ষে এসব ব্যবস্থা মোটেই কল্যানপ্রদ নয়;—সামাজিক অথবা শারীরিক, দু'টোই।"

—"আমি ঠিক অনুকরণ প্রবৃত্তি থেকে বলছি না;—বলছি, কতগুলি সংস্কার মুক্ত হ'তে পারিনি ব'লে জগতে বড়ই ক্ষুদ্র হ'য়ে রয়েছি আমরা। নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে এই সংস্কার আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে আমাদের। বিশেষ ক'রে বাঙ্গালীর ভিতরে নানা রকমের দোষ দেখা দিয়েছে নানাদিক থেকে।" ব'লে নীলিমা যেন পাশ কাটতে চায় স্বীয় অবস্থার।

—"সংস্কার মুক্ত হ'তে পারিনি ব'লে জগতে ক্ষুদ্র হ'য়ে রয়েছি,

এ উক্তির অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় তখনই, যখন লক্ষ্য করি যে, স্বামীতে দেবত্ব জ্ঞান বজায় রেখেই জ্ঞানে, দানে, ত্যাগে, শিক্ষায়, যুদ্ধে,—লীলাবতী, খনা, গার্গেয়ী, শৈব্যা, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি নারী থেকে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী, ধাত্রী পান্না, বীরাঙ্গনা রাজপুত ললনাগণ পর্য্যন্ত যে মহিমার পরিচয় প্রদান ক'রেছেন, বিদেশের ইতিহাসে তার তুলনা দুর্ল্লভ ;— যারা সংস্কার মুক্তির গর্ব্বে গৌরবান্বিত।

ভারতেতিহাসের গৌরব রাজপুতবালাগণের আদর্শ বীরত্ব, ত্যাগ, এ সবার মূলে ঐ সংস্কারটি। এবং, একমাত্র ঐ সংস্কারের বলেই পবিত্রতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর হয়ে কঠোর ত্যাগ, আর বীরত্বে স্তম্ভিত করতে পেরেছিলেন দিল্লীশ্বর পাঠানরাজ আলাউদ্দিনের ঔদ্ধত্যকে। আর বিভিন্ন কতকগুলি সংস্কার আকড়ে থেকেও ঐ 'অসভ্য জাপান' জ্ঞান বিজ্ঞানে আজ আর কারও পশ্চাতে পড়ে নেই।—

নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে যে দোষটি বাঙ্গালীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন আপনি, আমি বলছি যে দোষ আপনার ভিতরে,—দোষ আমার মধ্যে ;- বাঙ্গালী জাতির নয়। - তাই যদি না হ'ত, তবে মাতৃভক্তির সাংস্কার নিয়ে কি ক'রে এই বাঙ্গালীর ঘরে গ'ড়ে উঠলেন মহামানব বিদ্যাসাগর। কি ক'রে ভারতেশ্বর ইংরাজ রাজের আমন্ত্রণ উপেক্ষা ক'রে মাতৃ ভক্তির সংস্কার মাথায় নিয়ে, বাঙ্গলার বাঘ ব'লে পরিচিত হলেন মহামানব 'স্যার আশুতোষ'।—

বাঙ্গলার ঘরে সংস্কারের সেই আদিযুগ থেকে আজ পর্য্যন্তও এক একটা দিক্‌পালের মতই গ'ড়ে উঠলেন রঘুনন্দন, যিনি নবদ্বীপকে ভারতের বিদ্যাপীঠে পরিণত ক'রে তুলেছিলেন। - গ'ড়ে উঠেছিলেন

বুদ্ধ শীলভদ্র,-নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বাঙ্গালী!—আরও উঠেছেন—কবিত্বে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে, বাগ্মিতায়, যুদ্ধে, ক্রীড়ায়, ব্যায়ামে,—দেশের জন্য অনশন ব্রতে, অস্ত্রমুখে কিম্বা ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণদানে,—বালক খুদিরাম, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ; বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ বোস, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, সংস্কারাবদ্ধ প গলা ব্রাহ্মণ শিষ্য—স্বামী বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহামানব সুরেন্দ্র নাথ। সে যুগের সিংহল বিজয়ী বিজয়সিংহ থেকে এযুগের উজ্জ্বল রত্ন বাঙ্গলার ছেলে নেতাজী সুভাষ,-বাঘা যতীন, এঁরা কি বাঙ্গালী নন্?—এঁদের ভিতরে যে প্রতিভা রয়েছে—সমগ্র বিশ্বে কি খুঁজে পাবেন তার একত্র সমাবেশ, যা একমাত্র এই বাঙ্গলার ঘরেই সম্ভব হয়েছে? অথচ 'অশ্বত্থমা হত ইতি গজ' দোষটি খুঁজে নিজের অপরাধ একটা জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে, স্বীয় দোষস্খালনের ছিদ্রটি অনুসন্ধান করেন শুধু।"—

—"কিন্তু, দৃষ্টান্তের বড়াই ক'রে নিজে সন্তুষ্ট থাকা যে কত বড় আত্মপ্রবঞ্চনা, তা বোধ হয় বুঝতে বাকী থাকে না মোটেই?"

-"আর, স্বীয় অক্ষমতা এবং ত্রুটি ঢাকতে গিয়ে নিজের জাতির কাঁধে সে কলঙ্ক চাপিয়ে দেওয়াও যে কতবড় বাচালতা, সেটিও বোধ হয় স্পষ্ট বোঝা যায়- দৃঢ়কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করে রিনি।—

নীলিমা সঙ্কুচিতা হয় নিজের দুর্ব্বলতা স্মরণ ক'রে। কিছু একটা বলে প্রসঙ্গের ধারায় আত্মপক্ষ বজায় রাখতে গিয়ে সে উচ্চারণ করে,

—"কিন্তু, চেয়ে দেখুন দেখি ওই সংস্কার মুক্ত আমেরিকা প্রভৃতি

দেশগুলির প্রতি; তারা কত উন্নত! আর বাঙ্গলা আজ অন্নহীন কাঙ্গাল ;— কেন ?”

—“এ ‘কেনর’ উত্তর ওই সংস্কার মুক্তি নয়। আজ যে আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি ইহসুখের লীলাভূমি, তার একমাত্র কারণ, তারা বণিক্ বুদ্ধ্যাশ্রিত লুণ্ঠনকারী হ'য়ে জগতকে লুণ্ঠণ ক'রে চলেছে।— আর অপর দিকে, ধর্ম্মভীরু জাতিগুলি তাদের মিষ্টি প্রতারণা বাক্যে আস্থা রেখে এতাবৎ লুণ্ঠিত হ'য়েই এসেছে। আজ জগতের চোখ খুলেছে।—এই সুখ আর বেশীদিন ভোগ করা চলবে না।

ওদের যা কিছু শিক্ষা সে শুধু স্বীয় স্বার্থের জন্যই।—তাই, অর্থ থাকলেও আজ সমগ্র বিশ্বকে তাদের ভয়, সদা শঙ্কা কোন মুহূর্ত্তে না জগতের লুণ্ঠিত জাতিগুলি তাদের ঘাড়ে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে।” —

—“জগত তাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু, বর্ত্তমান জগতের সমস্যা সমাধান শুধু তাদের ন্যায় শিক্ষিত উন্নত, শক্তিশালী জাতি ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভবও নয়।”

“আর কারও পক্ষে সম্ভব কি অসম্ভব, সে কথা মেনে নেবার আগে স্বীকার নিশ্চয়ই করতে হবে যে, বিশ্বসমস্যাটা সৃষ্টি করেছেন শুধু ওই লুণ্ঠনকারী, শক্তিশালী শিক্ষাগর্ব্বী, সভ্যতাভিমানী যারা তারাই ; লুণ্ঠিত, দুর্ব্বল, মূর্খ, দরিদ্র, সংস্কারাবদ্ধ যারা তারা নয়। সুতরাং, এ সমস্যার কৈফিয়ৎটাও—তাদেরই দিতে হবে বৈ কি, অন্য কারও পক্ষে সেটি সম্ভব হবার পূর্ব্বেই !”

— “এবং, তারাই যে তা করবেন সেটিও ধ্রুব সত্য।”—

কিন্তু, সে সমাধানের সমস্যা আরও জটিল, পরস্পর বিরোধী।

নারীর প্রশ্ন

— লুণ্ঠিত জগতের সমস্যা দূর করতে গেলেই করতে হবে শোষকের আত্মপ্রায়শ্চিত্ত ; করতে হবে তার আত্মহত্যা।— আর লুণ্ঠন কারীর আসনে নিজেকে বসিয়ে রেখে সমাধানের যে অপপরিচয়, সে শুধু— ওই সমস্যাকে আরও জটিলতম করবে মাত্র।

আমার মনে হয়, এই সমস্যা সমাধানেই শেষ পর্য্যন্ত হয়তো ধরিত্রী স্নাতা হবেন রক্তগঙ্গায়। আর আজ তাই, জগতের বুকে কোথাও না কোথাও চলছেই এই হানা-হানি।— কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সমগ্র জগত আজ অশান্তিতে পূর্ণ। —এত শিক্ষা, এত সংস্কার মুক্তি, এত ত্যাগের বীজমন্ত্র প্রচার ;— এ সবার পরিণতি শুধু পৃথিবী ব্যাপী বিপ্লব আর অশান্তি মাত্র।—"

—"বিশ্বের উন্নতিকল্পে যুগে-যুগেই ধরিত্রী রক্ত-স্নাতা হয়েছেন ; তাঁর পঙ্কিলতা ধৌত হ'য়ে গেছে সেই রক্ত-গঙ্গায়।—"

— "আজও, আবার যখন সেই প্রয়োজন এসেছে, তখন দেখা যাচ্ছে লুণ্ঠিতের দেহে আর রক্ত নাই। আছে শুধু - সহিষ্ণুতার শেষে অসহিষ্ণুতার প্রেতাত্মাটুকু।- এই রক্ত স্নানের রক্ত তারা জোগাবে কোথা থেকে? এবার এ মহাযজ্ঞের শোণিত ধারা ঢেলে দিতে হবে লুণ্ঠিত ধন-ভাণ্ডারেপূর্ণ হৃদপিণ্ড গুলি মায়ের প্রিয় বলিরূপে।—"

—"জগতের সর্ব্বত্রই যে এই লুণ্ঠন কার্য্য চলেছে। প্রকৃতির নিয়মই যে এই। দুর্ব্বল যারা, তারা যদি না থাকতে পারে থাকবে না।—সবল সবলতর হ'য়ে তার স্থানে শক্তিশালী-বিশ্ব গ'ড়ে তুলবে।—"

নারীর প্রশ্ন

—"প্রকৃতি অপর সব কিছুর বেলায় তার প্রভাবটুকু পূর্ণমাত্রায় চালিয়ে যেতে পারেন বৈ কি।—কিন্তু, মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব; প্রকৃতিকে সে হার মানিয়ে দেয় তার সাধনায়। প্রকৃতির সঙ্গে মানবের এ যুদ্ধ চলেছে,—মানুষের সাধনা বুদ্ধি বিকাশের আদিযুগ থেকে: আজ আর মানুষ শুধু প্রকৃতির মুখ চেয়ে, ধর্ম্মের প্রতারণা বাক্যে মিথ্যা আস্থা স্থাপন ক'রে প্রবঞ্চকের আশ্বাস বাণীতে সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না। অজ্ঞ, দুর্ব্বল, দরিদ্র,—এরা এতকাল সরলভাবেই বিশ্বাস ক'রে এসেছে যে, তাদের সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টায়ই সমস্ত প্রচার কার্য্য চলেছে।—তাই, নত শিরে ঐ বাণীর মুখচেয়ে ব'সে তারা অবসর দিয়েছে সমস্যাকে গভীরতম হ'য়ে গ'ড়ে উঠতে। তারা য'দ সত্য সত্যই বুঝতে পারতো যে,—"দুর্ব্বল যারা, তারা যদি না থাকতে পারে তবে থাকবে না,—সবল তারস্থানে সবলতর হ'য়ে শক্তিশালী বিশ্ব গ'ড়ে তুলবে, তাহলে সমস্যা আজ এত গুরুতর হ'য়ে দেখা দিতে পারতো না।—বিশ্বের দুয়ারে এ ফাঁকিবাজী আজ প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে।—এবার তার সাধনার কাছে প্রকৃতিকে হার মানতেই হবে।—বিশ্বে চলবে বিশ্বস্রষ্টার সমদৃষ্টির রাজত্ব—অখণ্ড মানব রাজ্যের সর্ব্বসমতা বিচার; ভেঙ্গে যাবে ধনতন্ত্র।"—বলতে বলতে তন্ময় হ'য়ে যায় রিনি।—

নীনিমার বক্তব্য আপাততঃ পথ অন্বেষণ করে রিনিকে জব্দ ব্যতিব্যস্ত ক'রতে,—আর সেই ফাঁকে সেখানে দেখা দেয় অশোক।—

—(*)—

বাইশ

অশোকের উপস্থিতিতে—পুলক সঞ্চার ক'রে নীলিমার প্রাণে। এইবার তিতুর সহানুভূতি এবং সমর্থন লিপ্‌সায় রিনিকে জব্দ ক'রতেই শুধু তারই উক্তির সূত্রটি ধ'রে বলে সে,—

—"ধনতন্ত্রের সমালোচনা যদি করতে হয়, অবশ্যি ধনীকন্যা ব'লে আমার গৌরব নেই,—তিতুদির পক্ষ থেকে আমি বলছি যে, ধনী চিরকাল অর্থ এবং সামর্থ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে এসেছে অসমর্থ দরিদ্রকে।"—উক্তিটি শেষ ক'রেই চোরাবান মারার বাহাদুরী নিয়ে তাকায় একবার রিনির পানে।—অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করে তিতু।—পরক্ষণেই অশোকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় চলে নীলিমার,—মুখ টিপে হাসির তড়িৎ ভঙ্গে।—

—"ভুল করলেন নীলুদি; ধনীর সাহায্য পেয়ে গরীব বেঁচে আছে, এ উক্তি মোটেই সত্য নয়।—বরং শোষণ করবার শঠতা নিয়ে একদল বেঁচে আছে ধনী হ'য়ে, যখন নিরীহ আর একদল মানুষ তাদের যথা সর্ব্বস্ব সেই ব্যাবসাবুদ্ধির কাছে বিলিয়ে দিয়ে হয়ে আছে নিঃস্ব,—পরিচয় বিহীন,—দরিদ্র।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বালুকণা সূর্য্যোত্তাপে পুড়ে পুড়ে, আপনার পরিচয় হারিয়ে যেমন গ'ড়ে তোলে সাহারার শুষ্ক নিষ্করুন রাজত্ব,—তেমনি, সরল চিত্ত মানুষের দল পু'ড়ে পু'ড়ে, নিজেদের বিন্দু বিন্দু রক্তসিক্ত স্বেদকণা দিয়ে গ'ড়ে তুলেছে বিশাল শ্রম শিল্প,—কুবেরের ধনভাণ্ডার;—নিজেকে জগতের চোখে চির অপরিচিত

রেখে। ধর্ম্মকে মেনে বরণ করে নেয় কুবেরের ব্যঙ্গ; দাবী করতে জানে না স্বীয় শ্রমের মূল্য। আর আজ যদি তাদের সে ভুল ভাঙ্গে, নিজেদের পরিচয় সম্বন্ধে সজাগ হ'তে চায় তারা,—বিশ্বশুদ্ধ চলে ষড়যন্ত্র, তাদের পরিচয়হীন ক'রে রাখবার;- প্রমানিত হয় অপরাধী। যে মুহূর্ত্তে পরিচয় জ্ঞান লাভ করবে তারা, ধ্বসে পড়বে কুবেরের প্রাচীর; ছড়িয়ে পড়বে সে ধনভাণ্ডার বিশ্বময়, ছুটে চলবে অফুরন্তের বন্যা।

তাদের সেই রক্তপাত শ্রমের বিনিময়ে কুবের দল তাদের দেয় তুচ্ছ অংশ, পশুর শ্রমলব্ধ খাদ্য আত্মসাৎ ক'রে বিশিষ্ট জীবের স্পর্দ্ধায় আমরা যেমন তাকে দেই বিচালী মাত্র।" দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে চলে রেনুকা।

—"বুদ্ধিমত্তার পুরস্কার কেহই অস্বীকার করতে পারেন না। - ধন আহরণ ক্ষেত্রেও কেনই বা সে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবেন তাঁরা?"—দাবীর সুরে যেন কৈফিয়ৎ চায় নীলিমা।

- "ধন আহরণের অপবুদ্ধিকে যদি পুরস্কৃত করতে হয়, তবে সুচতুর ব্যবসায়িদের কালো-বাজারী আখ্যা দিয়ে দণ্ডিত করা পরম অন্যায় নয় কি?—অর্থ লিপ্সার শুভবুদ্ধি (?) নিয়ে কোন মানব, জগত হিতৈষী মহাত্মা কিম্বা মহামনীষী রূপে বরেণ্য হ'তে পারেননি আজিও। বরং, প্রকারান্তরে যারাই মানুষের সে শ্রদ্ধা লাভে সমর্থ হয়েছেন, তাদের সবাইকে করতে হয়েছে—ধনপিপাসা অন্তর থেকে বিতাড়িত।—নতুবা দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ মহানুভবকে ফেলতে হয় বুদ্ধিহীনের পর্য্যায়ে।

—"তবে অহরহঃ কৃপালাভ করেও ধনীর দুয়ারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনই প্রয়োজন নাই দরিদ্রের।"- রিনিকে লক্ষ্য ক'রে তীব্রভাবে প্রশ্ন করে অশোক তিতুর চোখে তাকে অকৃতজ্ঞ প্রমান করতেই যেন। সর্ব্বক্ষেত্রেই অশোকের প্রশ্নের ধারাই প্রায় এইরূপ। —সে শুধু খুঁজে বেড়ায় আক্রমনের দুর্ব্বল ছিদ্রটি, যতই কেন না হোক্ তাহা অপ্রাষঙ্গিক।

তীব্র কটাক্ষ বর্ষণ ক'রে,—পরক্ষণেই একটা শ্লেষ কণ্ঠে জবাব দেয় রিনি,—"সে পরিচয় জেনে তুমি কি ক'রবে অশোক দা? চাঁদের আলো মনভুলায় সত্য; কিন্তু, সূর্য্যকে সরিয়ে নিলে তার যে 'কানা কড়িরও মূল্য' থাকবে না, এটাও বোধ হয় তোমার অজানা নেই?"

এই নিষ্ঠুর আক্রমণে নীলিমার সম্মুখে যে তীব্র অপমান শেল বিদ্ধ করা হ'ল অশোককে, তাহাতে রাঙ্গা হ'য়ে উঠল তার সমগ্র মুখমণ্ডল। অশ্বস্তি বোধ করে তিতু, নীলিমাও যেন আতঙ্কিতা হ'য়ে পড়ে এই মুখরার কাছে।

ক্ষিপ্তের মতই জবাব দিতে গিয়ে কি যে বেরিয়ে গেল অশোকের মুখ থেকে, তা বোধ হয় সে নিজেই টের পেল না।—"লোকে বলে, গরীবের সবই বিশ্রী। ভদ্রতা তো তারা হারিয়ে বসেই, তা ছাড়া, morality (নীতিজ্ঞান) ও তাদের থাকে না Demoralised creature (নীতিজ্ঞানহীন পশু) হ'য়ে পড়ে একেবারে।"—ব'লেই ক্রোধ-গম্ভীর ভাব ধারণ করে সে।—

রিণি শান্তভাবেই ব'লে যায়, "গরীবের সবই বিশ্রী; শ্রী যে তাদের কোন কিছুতে নাই. তোমার ন্যায় অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই সেটি ব'লে গেছেন বহুবার !—কিন্তু, ভদ্রতা তারা হারায় না, এটাও ততোধিক সত্য।—অভদ্র বিবেচিত হয় ধনীর দুয়ারে,—যেহেতু, ভদ্রতার পোষাকে বর্ব্বরতাকে প্রশ্রয় দিবার উপায় তাদের নেই।

দরিদ্র ধনীকে ভয় করে; রাজপুরুষকে শ্রদ্ধা করে; ঈশ্বরকে পূজা করে, আপন সহ-জাত নিরুপায় পরিবেশে,—তাঁর অস্তিত্বকে মেনে নিয়ে।—তাই, ইহকাল পরকাল ভয়ে নানাদিক্ দিয়ে অন্যায় অপকর্ম্ম করতে দ্বিধা বোধ করে, সঙ্কুচিত হয়।— — আর ধনী,—ধনমদে গরীবকে করে ঘৃণা, রাজপুরুষকে করে উপেক্ষা, অস্বীকার করে পরমেশ্বরের অস্তিত্বকে। 'ধরাকে সরাজ্ঞানে' একমাত্র ভোগের স্থান জেনে, পরলোকে অবিশ্বাসী ধনগর্ব্বী, অবাধে বিনা দ্বিধায় অন্যায় অপকর্ম্ম ক'রে চলে স্বাধীন ভাবে। : orality (নীতিজ্ঞান) যে কি, মুখে আওড়ালেও চিন্তা করবার মত আত্মসংযমটুকু পর্য্যন্ত তাদের নেই। Demoralised creature (নীতিজ্ঞানবিহীন পশু) যদি কেউ থাকে; তবে তারাই।—"

অশোক ক্রোধে কাঁপছিল। তাকে কিছু বল্‌বার অবসর না দিয়েই নীলিমা ব'লে বসে,—"কিন্তু, ধনীরও যে প্রয়োজন রয়েছে রিনি দি। — তাই তো বিশ্বকবি কবিতার ভাষায় জানিয়েছেন —"সব হ'লে সমতল সমভূমি পারা, বহিত কি ঝরণার সুমঙ্গল ধারা!"

"সে ওই শোষিত ধনস্তূপ নয়, কিম্বা, 'সাত ফুট ছ' ইঞ্চি' লম্বা যারা তাদেরও বড়লোক বলে, উঁচু নীচুর ব্যাখ্যাটা করা হয়নি নীলুদি।—

নারীর প্রশ্ন

আর ওরা বলেন,—'মানুষ যেমন আত্মজ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত বাইরের মন্দিরে ভগবানের সাহায্য খুঁজে বেড়ায়, দরিদ্রও তেম্নি, আত্মশক্তি জ্ঞানাভাবে, সদগুরুর অভাবে দীন দুর্ভাগা সেজে বৃথাই ঘুরে বেড়ায় 'কুবের ভাণ্ডারের' দ্বারে দ্বারে ঐ সুমঙ্গল ধারার সাহায্য পিপাসায়। অহং বোধ শূন্য হ'য়ে জগতে অবস্থান করার সাধু আদর্শকে সাধারণ মানব যেমন গ্রহণ করতে পারে না, শিউরে ওঠে স্বীয় অস্তিত্ব হীনতার মিথ্যা কল্পনায়,—তেম্নি, ধনতন্ত্রবিহীন গনতন্ত্র, সাম্যবাদ কতগুলি রাজনীতিবিদেরা বুঝতেই চান না। এবং, বর্ত্তমানে এরাই ওইরূপ প্রচারকার্য্য চালিয়ে বিপথগামী করেন জনসাধারণকে, বেঁধে যায় সংঘর্ষ।

গরীব ধরিত্রীর মতই সহনশীল। নারায়ণের মতই বৈষ্ণব। তাই ধনীর ধনতন্ত্র আজও বেঁচে আছে। দরিদ্র আপনার বুক চিরে রক্ত দিয়ে পোষণ ক'রে চলেছে ধনীকে। তাই, স্বামীজি বলেছেন, 'দরিদ্র নারায়ণ'। আর আমি বলতে চাই নীলুদি,— দরিদ্র নারায়ণেরও ঊর্দ্ধে। তার নিদর্শন নারায়ণ স্বয়ং। বুভুক্ষু ভৃগুর পদাঘাত সগৌরবে বক্ষে ধারণ করলেন, বিশ্বসিংহাসনে বিশ্বরাজরূপে অধিষ্ঠিত থেকেও উপবাসী, অনশনক্লিষ্ট একজন নিরন্ন প্রজার মুখে একমুষ্টি অন্ন তুলে দিতে পারেন নি ব'লে। বৈষ্ণবের আদর্শ বিষ্ণু, অহিংস মন্ত্রের মূলাধার সুদর্শন নিয়ে তেড়ে উঠলেন না বুভুক্ষিতের ঔদ্ধত্যের শাস্তি বিধান করতে। আর আজ, সেই অহিংস মন্ত্রের ছলনায় সিংহাসনে অধিরূঢ় হ'য়ে, কোটি কোটি নিরন্ন প্রজার মুখে এককণা অন্ন সংস্থান না করে,—অনাহারে জীর্ণশীর্ণ, মরণ

নারীর প্রশ্ন

পথের যাত্রী ক্ষুধার তাড়নায় যখন দলে দলে চীৎকার ক'রে বেড়ায় 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' ক'রে, অনন্যোপায় হ'য়ে ইটপাটকেল ছুড়তে যায় বধির প্রতিকারের প্রতি, তখন অহিংস উপাসকের দল ধনীর মুখে পোলাও তুলে দিতে দিতে এই দুর্ভাগাদের পাঠায় কারাগারে,—ঢিল ছুড়বার অপরাধে রাস্তায় হত্যা করে অহিংস সুদর্শন বেয়নেট্ আর গুলির আঘাতে। এর চাইতে ও কি দেখতে চান সুমঙ্গল ধারার প্রবাহ ?"—বলতে বলতে রিণির মুখখানা লাল হয়ে ওঠে ;- ভাবে আত্মহারা হয়ে কোথায় চলে গেছে সে !

মহিমময়ীরূপে রেনুকা দেখা দিল যেন তিতুর চোখে। স্তব্ধ অবাক্ বিস্ময়ে সে শুনছিল রিণির প্রতিটি উক্তি। ধীরভাবে প্রশ্ন করে তিতু,—

- "কিন্তু, ইট্‌পাটকেল ছুড়ে কি আর কোন বাস্তব প্রতিকার সম্ভবরে রিণি ? শুধু অশান্তি আর বিপ্লবই যে ডেকে আনা হবে তাতে। লক্ষ লক্ষ লোক জীবন দান করবে মারাত্মক অস্ত্রের মুখে ; সমাজ হবে বিপন্ন।"

– "ইট্‌পাটকেল ছুড়ে বিপ্লব আনা যায় না তিতুদি। বিপ্লবই ইটপাটকেল ছুঁড়ে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দেয়। ধূম আর গলিত ধাতু রাশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করে না ;- যে গ্লানি ভিতরে জমে ওঠে তারই ফলে সুরু হয় আলোড়ন আর কম্পন ; উৎক্ষিপ্ত হয় অগ্নিপ্রবাহ আর ইট পাথর।

এখনও সময় আছে। সমাজের এই গ্লানি বিদূরিত হ'লে এখনও বিশ্বে শান্তি আসতে পারে। নইলে মৃত্যুপথের যাত্রী, বুভুক্ষু

নারীর প্রশ্ন

দুর্ভাগার দল আজ জেগে উঠেছে বাসুকীর মতই ফণা তুলে। তারা জেনেছে,—মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে, অনশনের সঙ্গে সংগ্রাম না ক'রে শোষকের সঙ্গে সংগ্রামই ধ্রুব পন্থা।

আর সে অত্যাচারী শোষক যদি বা হয় অসীম ক্ষমতাশালী, তথাপি তার পরিনাম সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস যুগে যুগে। সীতা অপহরণকারী স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর, শমন-দমন দশানন, বিমানশক্তি-গর্ব্বী বাসববিজয়ী পুত্র মেঘনাদ সহায়,— নাগপাশ, শক্তিশেল প্রভৃতি অমোঘ শস্ত্র-সন্ধানী,— সমুদ্র পরিবেষ্টিত নিরাপদ আবাসে স্বীয় অত্যাচারের ফল ভোগ করলেন, শুধু কীল চড়-চাপড়, গাছ পাথর আর ইটপাটকেলের শক্তির কাছে;—বিজ্ঞান বিহীন অনার্য্যরাজ সুগ্রীবের সেনা বাহিনীর সমুদ্র বন্ধনের নিকটে।

আর আজিও যাঁরা 'সাত-সমুদ্র তের-নদীর' পরপারে ব'সে নিরাপত্তার গৌরবে, বিমান আর আনবিক শক্তির অহঙ্কারে জগতে শোষণ আর অত্যাচার চালিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখেন, এবং যাঁরা সে স্বপ্নের খোরাক জুগিয়ে চলেন তাঁরা অযথাই ভুলে যান যে, বিশ্বধর্ম্মের নিকটে ঐ সমুদ্রের দুরত্ব, আর অস্ত্র শস্ত্রের আস্ফালন অতি নগণ্য। শক্তিশেল আর গগন বিহারী বিমান ইটপাটকেলের আঘাতেই চুর্ণ হ'য়ে যায় যুগে যুগে।"

তিতু বোঝে রিণি অনেকদূর এগিয়ে গেছে অমলকৃষ্ণের শিক্ষাধীনে।

- (*) -

তেইশ

নারী বাহিনীর বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রাগালোচনা উপলক্ষে বিশেষ সভ্য-সভ্যাদের নিয়ে শ্রীমতী সেন অমলকৃষ্ণকে পৌরহিত্যের আমন্ত্রন জানিয়েছেন। সে আমন্ত্রন সাদরে গ্রহণ ক'রে জানায় অমল,

— "কিন্তু, পৌরহিত্য গ্রহণের পুর্ব্বে এটা জেনে নেওয়া বোধ হয় আমার মোটেই অন্যায় হবে না যে, আমার বক্তব্য বিষয়টা আপনাদের কাছ থেকে অবহিত থাকা।" সরল মৃদু হাসির রেখা দেখা দেয় তার ওষ্ঠাধরে।

—"যতটা অজ্ঞতার ভান করছেন, ততটা নিশ্চয়ই আপনি নন্ অমলবাবু। নারীর অভিযোগগুলি সম্বন্ধে কি আপনি এতই অপরিজ্ঞাত? স্ত্রী স্বাধীনতা, নারীর শিক্ষা এবং দাবিগুলি সম্বন্ধে কি একবার চিন্তাও করেন না কখনও? যারা জেগে ঘুমায় তাদের আর কি করা যায় বলুন?" বিশেষ অভিযোগের সুরে অমলের কথার জবাব দেয় অশোক।

—"এটা :আমার উপর নিছক জবরদস্তি। যেহেতু, আমি নারী নই, তাদের অভিযোগ কি করেই বা আমি বুঝতে পারি?" আবার মৃদু হাসেন অমল। এ হাসি তার স্বাভাবিক, সুখ দুঃখ সর্ব্বাবস্থায়। তারপরে পুনরায় বলে যান সরল কণ্ঠে,—

—"আর শিক্ষা এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার ধারণা, আমাদের সমগ্র জাতির স্বাধীনতাই যেখানে ক্ষুণ্ণ, শিক্ষা যেথায় বিকৃত এবং

পঙ্গু, সেথায় একটা অংশের শিক্ষা এবং স্বাধীনতাও যে পঙ্গু হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কিছুই নাই।''

—"লেখাপড়া শিক্ষালাভ করে নারী হবে স্বাধীনা; পুরুষের দয়ার পাত্রী হয়ে দিন কাটাবে না ঘরের কোণে অসহায়া অবস্থায়।''— —নারীর পক্ষ হ'তে অভিযোগটা জানায় অশোক।

—"স্বাবলম্বী হওয়াটা সর্ব্বত্র লেখা-পড়া শিক্ষা লাভের উপরে নির্ভর করে না। বিশেষতঃ যে দেশের অধিকাংশ পুরুষেরাই অক্ষর জ্ঞানহীন, সে দেশের সমগ্র নারী সমাজের স্বাবলম্বন লেখা-পড়ার ভিতর দিয়ে কতটা যে সম্ভব, বুঝতে পারি না। অপর দিকে, বর্ত্তমান যুগের লেখা-পড়া শিক্ষা স্বাবলম্বী গৃহস্থকে গ ড়ে তুলেছে কেরাণী ক'রে, কৃষক-মজুরকে বাবু ক'রে, আর বাবুকে নিষ্কর্ম্মা ক'রে। সুতরাং, আপনি কি আশা করেন যে, সেই শিক্ষা নারীকে করবে স্বাবলম্বী? বরং, আমার মনে হয় উহা তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের বেকার সমস্যাই বাড়িয়ে দিবে শুধু। আর মানুষ হ'য়ে গ'ড়ে ওঠার জন্যও যদি লেখা-পড়া শিক্ষার প্রয়োজন হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও আমার বক্তব্য,—education is the masterkey to all the ways of life. লেখা-পড়া শিক্ষা মানুষের নিজ নিজ উদ্দেশ্য এবং চরিত্র পথের চাবিকাঠি-স্বরূপ।—উহা মনুষ্যত্ব প্রদান করে না। — মানুষকে মানুষ ক'রে তোলে একমাত্র বিবেক বুদ্ধি,— আর ধর্ম্মজ্ঞান, যার অভাবে বর্ত্তমান জগতের এত বিদ্যাচর্চ্চা সত্বেও সভ্যতা গর্ব্বী মানুষ আজ অসভ্য মানুষেরও পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে।—একে

অপরের স্বাধীনতা হরণেই উদগ্রীব, যদিও নারীর স্বাধীনতা কামী তাঁরা।—

আর, আমাদেরই দেশে একেবারে অক্ষর জ্ঞান লাভ না ক'রেও শ্রেষ্ঠ তিনজন নরপতি খ্যাতি লাভ ক'রে গেছেন ইতিহাসে,—সম্রাট বাদশাহ আকবর, ছত্রপতি শিবাজী, আর পাঞ্জাব কেশরী শিখবীর রণজিৎ সিংহ।" –

—"লেখা-পড়া শিক্ষাই কি আজ মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে তুলে ধরে নাই, সভ্যতার আলোক দেখিয়ে দেয় নাই?"—বিস্ময়ান্বিত চোখে অমলকৃষ্ণকে অজ্ঞ প্রমাণ করতেই উক্তি করে অশোক।

—"গোটা কতক শিল্প আর অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কারই যদি সভ্যতা এবং উন্নতির পরিমাপ হয়, তবে আপনার উক্তির বিরুদ্ধে কোনই যুক্তি নেই। আমার সাধারণ জ্ঞানে দেখি, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদ জীবও মানুষের সহবাসে হিংসা ভুলে শান্ত স্বভাব হয়, কণ্টকযুক্ত গোলাপ মানুষের উদ্যানে এসে কণ্টক বিহীন হ'য়ে যায়।– আর আমরা মানুষ, লেখা পড়া শিখে শিখে হয়ে পড়েছি ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদাপেক্ষাও হিংস্রতম, কুকুর অপেক্ষাও স্বজাতি-দ্রোহী।– নিজের সীমানা পেরুলেই তাই তো দেখা যায় আসামে 'বাঙ্গালী খেদা', সিংহলে ভারতীয় বিতাড়ন, আফ্রিকায় কৃষ্ণকায় ঠেঙ্গানো', আর পাকিস্তানে অমুসলমান উচ্ছেদ প্রভৃতি মনুষ্যপ্রীতির নিদর্শন। সমগ্র মানব জগতের শিক্ষার আমুল পরিবর্ত্তনই যে প্রয়োজন! "

নারীর প্রশ্ন

—"বর্ত্তমান শিক্ষাকে আপনি দোষারোপ—করেছন সত্য, কিন্তু, প্রাচীন শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করলে যে বর্ব্বরতাকে—আমরা দেখতে পাই সে গুলির পক্ষে অপনার কি যুক্তি বলুন দেখি ?—

ভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সাধ্বী স্ত্রী অসহায়া সীতার নির্ব্বাসন, মহামানব ভৃগুরামের মাতৃহত্যা ? নারীর প্রতি যুগে যুগে এই যে অবিচার, অসম্মান এগুলিকেও কি আপনি অস্বীকার করতে চান ?'

—"আমি রক্ষণশীল মোটেই কিছু নই। এবং, প্রাচীন ব'লেই সবকিছুর পরিবর্ত্তনকে অস্বীকারও করি না। দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তার বিধি-নিষেধ গুলিরও পরিবর্ত্তন হবে বৈ কি ?

শ্রীরামচন্দ্রের সীতা নির্ব্বাসন স্ত্রী জাতীর নিকট যদি বিবেচিত হয় বর্ব্বরতা, লক্ষ্মণ বর্জ্জন তবে ভ্রাতৃ-জাতির কাছে নৃশংসতা। ভরতের রাজ্য ত্যাগ রাজনীতি বিশারদদের কাছে মূর্খতাই শুধু।- ভৃগুরামের মাতৃহত্যা যদি পৈশাচিক, মাতার সম্মান রক্ষার্থে বভ্রুবাহনের পিতৃহত্যা, দানবীর কর্ণের পুত্র বলিদান,—এগুলি বা তবে কেন না হবে বর্ব্বরতার নিদর্শন ? মানুষ স্বীয় আসনে অধিষ্ঠিত থেকে আদর্শ রক্ষায় যে কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন তার কাছে স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা. ভ্রাতা, ভগ্নী, – এমন কি স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্তও অতি তুচ্ছ।—ইহাই আদর্শ পূজা, সমাজ কল্যানপ্রদ।

শ্রীরামচন্দ্রের সীতা নির্ব্বাসন স্মরণ করতে আমরা ভুলে যাই যে, রাজর্ষি জনক কন্যার বরপণের ডালি সাজিয়ে রামচন্দ্রকে খুঁজে হয়রাণ হননি।—পাঞ্চালীর বিবাহে ব্যস্ত হ'য়ে দ্রুপদরাজ খুঁজে বেড়াননি

নারীর প্রশ্ন

মহাবীর ধনঞ্জয়ের সন্ধানে বরপন আর যৌতুকের টাকা পকেটে ক রে। —শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে, উপযুক্ত মূল্য দিয়ে গ্রহণ করতে হয়েছিল সীতা আর দ্রৌপদীকে। আদর্শ রক্ষায় নির্ব্বাসন এবং অক্ষপণ রাখতেও যারা কুণ্ঠিত হননি,—আবার সাগর বন্ধন, এবং সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষপরেও নারীর অবমাননাকারী দুর্ব্বৃত্তের বক্ষরক্তে পাঞ্চালীর উন্মুক্ত বেণী বন্ধনেও বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হননি তাঁরা —নারীর সম্মান আর মর্য্যাদা স্মরণ ক'রে, যখন এ যুগের আদর্শ বাদী শিক্ষাভিমানীরা অহিংস আদর্শের প্রচারে সহস্র সহস্র নারী হরণকে অবহেলা ক'রে চলেন নারীর প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রে।—

স্বামীহারা বালবিধবার দুঃখে উদ্বেলিত হ'য়ে শাস্ত্রকে ধিক্কার দিতে গিয়ে বাহাদুরী দিয়ে বসি, মোটে স্বামী না পাওয়া কুমারীদের অবিবাহিতা থাকার কৃতিত্বকে।"—

শ্রীমতি মলিনার মুখখানি ম্লান হ'য়ে ওঠে বেদনায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জানায় তিতু, "কিন্তু, এই বরপণই কি বাধ্য করে না শত সহস্র মেয়েকে কুমারী থাকার পণ গ্রহণ করতে? নারীর প্রতি উহা কি নয় পুরুষের,—সমাজেরও চরম অবজ্ঞা?"

—"বিন্দুমাত্রও সংশয়ের অবকাশ নাই এ ক্ষেত্রে। বরপণ যেমন উচ্চবর্ণে, কন্যাপণ তেমনি নিম্নবর্ণে বাধ্য করে শত শত পুরুষকে বিবাহ সমস্যার সম্মুখীন হ'তে। পুত্র এবং কন্যার একই পিতা-মাতার সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকারই স্বাভাবিক; এবং, কন্যার

সেই ন্যায্য অংশটি যদি সরল বিশ্বাসে কন্যার বিবাহ কালে দিয়ে দিই বরপণ এবং যৌতুকরূপে, তবে আর এ বিষয়ে প্রশ্নটা ততটা গুরুতর হ'য়ে দেখা দেয় না। কিন্তু, অবজ্ঞার প্রশ্ন তো সেখানে নয়! বিবাহ যেথায় নারী এবং পুরুষ উভয়েরই প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে নারীকে বিবাহ যোগ্যা ক'রে পুরুষের সমান ক্ষেত্রে আনয়ন করতে যে অলঙ্কার এরং অর্থের প্রয়োজন সেই অবমাননাই শুধু'—নারীর মূল্য নির্ণীত হয়, "নারী। অলঙ্কার+যৌতুক=পুরুষ। সুতরাং, এই মূল্য বিচারই মেয়েদের মনে জাগিয়ে তোলে প্রকৃত বেদনা বোধ।"—

পিতৃধনে পুত্রকন্যার যে অন্যায় অধিকার বিচার, সেটিও কি নারী জাতির প্রতি অবিচার নয়?"—

—"এর চাইতেও অবিচার সর্ব্বত্র।—একই সরকারী চাকুরীতে সমযোগ্যতা সম্পন্ন লোকের সমান সমান পদে সমপরিমান শ্রম সত্বেও; অন্তবর্ত্তী সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের নামে বেতন বৈগুণ্য;—'সেক্রেটারিয়েট' এবং তদ্বহিরস্থ কর্ম্মিদের। অথচ সে অবিচারে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে, জানিনা সে কর্ম্মকর্ত্তার দল কোন দরদ নিয়ে হিন্দুকোড বিলে নারী-পুরুষের উত্তরাধিকার নিয়ে মাথা ঘামান।—

নারী অপেক্ষা পুরুষের শারীরিক গড়ন স্বভাবতঃই ঘাতসহ। তাই, মানব সমাজ যুদ্ধ-বিগ্রহ, জমি-জমার হাল-চাষ এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের হিসাব নিকাশ প্রভৃতি ঝঞ্ঝাট আর গুরু আয়াসসাধ্য কাজগুলি বিভাগ ক'রে দিয়েছিল সেই পুরুষেরই হাতে।

আর নারী প্রকৃতির ব্যবস্থানুরূপ শিশুপালন প্রভৃতি,- এবং সংসার মধ্যস্থিত সহজসাধ্য কাজগুলি সম্পাদন ক'রে গুছিয়ে তুলবে, - নারী পুরুষ মিলে পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত পরিবেষ্টিত সুখের সংসার। সংসারের আয়-ব্যয়, রক্ষণা-বেক্ষণের ঝড়-ঝাপটা বিব্রত করবে না নারীকে। বরং শান্তির নীড়ে ব'সে সে বিব্রত পুরুষকে দিবে শ্রমে শান্তি, হতাশায় উদ্যম।- সুতরাং, সে দিনের সে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ব্যবস্থা না থাকলেও, যিনি ধর্ম্মে কর্ম্মে জীবনের অর্দ্ধাঙ্গ ভাগিনী,- ওই সম্পত্তিতে তার অনধিকারই বা প্রমানিত হয় কি ক'রে।"—

—"ওই ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে নারীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী ব'লে গ্রহণ ক'রে তার প্রতি যে উপেক্ষা প্রদর্শন,- সে গুলিও কি অবিচার নয়?"—

— "ধর্ম্মকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ব'লে যাঁরা জেনেছিলেন, এসব ব্যবস্থা ছিল তাঁদেরই। আর যেদিন থেকে মানুষ চলেছে পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মে অনাস্থা, এবং সেই ধর্ম্মবিশ্বাসী বিধিনিষেধগুলি নিয়ে,— সেদিন থেকেই সুরু হয়েছে এই ব্যভিচার।"—

—"আজ, এই সম্মিলিত নারী শক্তি প্রতিকার চাইছে ওই সমগ্র ব্যভিচারের।—স্বাধীন ভাবে আজ তারা রক্ষা করবে নারীর সম্মান, —সংগ্রাম ক'রে চলবে চিরজীবন কুমারী থাকার ব্রত নিয়ে,- বরপণ প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে।"—

—"এর মূলে আঘাত হানতে হ'লে প্রথমতঃ প্রয়োজন, নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে মনুষ্যত্বের সন্ধান লাভ করা। চিরকুমারী থাকার পণ গ্রহণ ক'রে কায়মনোবাক্যে যদি না সে ব্রতের শুচিতা সম্পাদিত

হয়, তবে, প্রতিপক্ষের চোখে অধিকতর হেয় প্রতিপন্ন হতে হবে পণ গ্রহীতাকে। নারীর পবিত্রার মূল্য যতই সহজলভ্য হবে, ততই কমে যাবে তার সম্মান; বিবাহ সমস্যা হবে অধিকতর ঘনীভূত। অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি দান না করে তাকে স্বাধীনভাবে রাস্তায় চলবার নির্দ্দেশ দিলে যতটুকু উপকার করা হয় নারীকে তেমি এই স্বাধীনতার পথ দেখিয়ে দিলে তার অধিক কিছু আশা করা যায় না।”—

তিতু স্তব্ধ হ'য়ে শুনে যায় সে আলোচনা; প্রাণে তার দ্বন্দ্বের তুফান। পণের সম্মান সে রক্ষা ক'রতে জানে, মনের সে ক্ষমতাকে যথেষ্ঠ বিশ্বাসও করে সে।

কিন্তু, বিদ্রোহী মনোরাজ্যে তার কবে যে প্রকৃতি গোপনে 'পঞ্চম বাহিনী' পাঠিয়ে পরাজয়ের ষড়যন্ত্র এঁটে চলেছিলেন আজিও তাহা জানিতে পারে নাই তিতু। দোদুল্যমান মনের মানদণ্ডে তাই সুরু হয় জয়-পরাজয়ের আলোড়ন।

চব্বিশ

— (*) —

নারী বাহিনীর বার্ষিক অধিবেশন আসন্ন ; এরই মধ্যে প্রকাশ পেল—"বাহিনীর অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীমান অশোক চন্দ্র দত্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠা কল্পে, বরপণ উচ্ছেদ কামনায় সভ্যা শ্রীমতী নীলিমার পানি গ্রহণ করিবেন, সর্ব্বপ্রকার দাবি দাওয়ার প্রশ্নকে দূরে রাখিয়াই।"

বাহিনী-সঙ্ঘে সংবাদটি প্রচারিত হ'তেই মুখর হ'য়ে উঠলো সবাই। এবং, ইহাকে উপলক্ষ্য ক'রে আনুষ্ঠানিক পর্ব্বের আয়োজন উৎসাহের সঙ্গে চলতে থাকলো।

সংবাদ পরিজ্ঞাত হওয়া মাত্র যৎপরেনোস্তি বেদনা অনুভব ক'রলেন দত্ত। তিতু যদিও সেদিন গৃহিণীর মুখের উপর নিরাশার বাণীই শুনিয়েছিল, তথাপি উহা কি ছেলে মানুষের সাময়িক চাঞ্চল্যের উত্তেজনা ব'লে গ্রহণ করা চলে না? গৌরিশঙ্কর বাড়ী ফিরলেই তিনি যে এ সমস্ত গুছিয়ে নিতে পারবেন, এ আশালতাটি ক্ষীণ হ'লেও দত্ত তাহা ছিন্ন ক'রতে সক্ষম হননি মোটেই। অথচ, এরই মধ্যে কী অঘটনটাই না সৃষ্টি ক'রে বসলো অশোক! আবার নিজের মনেই একটা সান্ত্বনাও রচনা ক'রে বসেন নিজেই, "বধূ হিসেবে তিতুর চাইতে নীলিমা মন্দই বা কিসে? সম্পত্তি?—সে যে বড় দারোগা বাবুর কাছে কিছুই নয় অশোকের মামাবাবুই তার প্রতক্ষ্য প্রমাণ। তা ছাড়া লোকে কথায় বলে,—"জমি করবে

উরে (নিকটে), কুটুম করবে দূরে' ;—বাড়ীর কাছে কুটুম করতেও নেই।

*　　*　　*

বার্ষিক অধিবেশন দিবসে অমলকৃষ্ণের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহান্তে অশোক আর নীলিমার শুভ মিলন সংঘটিত হ'য়ে গেল সভাপতির পৌরহিত্যে।

বধূবেশে সাজাতে গিয়ে তিতু যখন নীলিমার বাক্সটা গুছিয়ে দিচ্ছিল,—এটা সেটা গুছিয়ে নেবার সঙ্গে চোখে পড়লো সেদিনের সেই চিঠিটা। হঠাৎ একটু স্তম্ভিত হ'য়ে গেল তিতু ; মনে পড়লো নীলিমার সেদিনের সেই প্রশ্নটা। তারপরে আবার রেখে দেয় সে চিঠিখানি তেম্নি, কাউকে জানতে দেয় না কিছুই।

অশোক আজিও জানে না যে নীলিমা বিবাহিতা।

*　　*　　*

এরই পরে রদ বদল হ'য়ে গেল আরও অনেক কিছুর। স্বর্গগত প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পুত্র পাশ ক'রে বেরুতেই স্বেচ্ছায় তাকে পদটি ছেড়ে দিলেন অমল।

দেশ বিভাগের ফলে আশ্রমটির অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে পড়েছে অধিকাংশ শিষ্য, সভ্য-সভ্যা এবং চাঁদা দিবার লোক রাষ্ট্রান্তরে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছেন। ফলে, আশ্রমটি ভেঙ্গে পড়বার কিনারায় উপস্থিত। অমলকৃষ্ণের ইচ্ছা,– তাই, আশ্রমে গিয়ে তার সেবা ক'রে জীইয়ে রাখেন তাকে।

নারীর প্রশ্ন

এই সময় শিক্ষক এবং অধ্যাপকের অভাবও বেশ অনুভূত হচ্ছিল এ অঞ্চলে। শ্রীমতী সেনের প্রস্তাবে কর্ত্তৃপক্ষ অমলকৃষ্ণকে টেনে নিলেন শহরে মহাবিদ্যালয়ের একটি পদে। তিতু জানলো,—জ্যাঠামশাই ফিরে এলেই অমলদা চলে যাচ্ছেন আশ্রমে।

নববধূ সেজে চ'লে গেছে নীলিমা। রায়গৃহে এখন অশোকের আগমন কদাচিৎ বা হয়;—অমলকৃষ্ণ কলেজ সেরে কখন আশ্রম, কখন বা শ্রীমতী সেনের সঙ্গে আলাপ আলোচনান্তে গৃহে ফিরেন সেই রাত্রিতে। জ্যাঠামশাই তীর্থে; বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করে তিতু।

—"জ্যাঠাইমনি এম্নি কতদিন ঘুরে বেড়াবেন তীর্থে তীর্থে! তীর্থ থেকে ফিরে এলেই কি আর ভাল লাগবে গ্রামে? প্রায় সবাই যে চ'লে গেল গ্রাম ছেড়ে! রিণিরাও চলে যাবে বোধ হয়। অমলদাও যদি আশ্রমে ফিরে যান, জ্যাঠাইমনিও যে আশ্রমে ব'সেই কাটিয়ে আসবেন দিনটা!—তবে?

না;—অমলদার যাওয়া হবে না আশ্রমে মোটেই।"

সেদিন নব বসন্তের সন্ধ্যায় কত কি চিন্তায় ভাল লাগছিল না তিতুর। অমলকৃষ্ণ তখনও ফিরেননি শহর থেকে। স্থির ক'রে ব'সলো সে,—'বলতেই হবে অমলদাকে যে, আশ্রমে যাওয়া হবে না তার কিছুতেই।'

তারপরেই, আপনমনে বাইরে চ'লে গেল সন্ধ্যার আঁধারে উদ্যানের পার্শ্বে,—যেথায় সান্ধ্য কুসুমের নব সোহাগে ভুলে প্রমত্ত ভ্রমর ফিরতে পথ হারিয়ে গেছে অন্ধকারে।—দু'টি ফুল তুলে তিতু পরেছে মাথায়, —আর ভ্রমর কিনা প্রেম গুঞ্জন জানাতে এল তারই কুসুম-সম

নারীর প্রশ্ন

মুখখানার কাছে,—আঁধারে কুসুম ভ্রমেই বুঝি। কপালে ছোট একটা ঢু লাগতেই অবশেষে পালিয়ে গেল দুষ্ট ভ্রমর,—হবে বা লজ্জায়!

পাদচারণা করতেই সেদিক থেকে তিতু চ'লে গেল পথটার পাশে। সান্ধ্য সমীরণ স্পর্শে মৃদু সঙ্গীতকণ্ঠী সে,—ঐ সবে সুর খোলা 'বউ কথা কও' পাপিয়ারই মত।—কত কি চিন্তায় সে আজ তার মনটাকে ছেড়ে দিয়েছে অনেক দূরে,—যে আর ফিরতে পারছে না ঐ পথহারা ভ্রমরটারই মত।

পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে অমল। এলিয়ে পড়া কেশভার,—আনমনা সঙ্গীতকণ্ঠী ঐ মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্য, অমলকে দেয় স্তম্ভিত ক'রে। আত্মস্থ হ'তেই, সে সাইকেলের 'বেলটি' দেয় বাজিয়ে—অতি আস্তে। চমকে ফিরে দাঁড়ায় তিতু,—সলজ্জা, শঙ্কিতা হরিণীর মত। মুখোমুখি হ'ল দু'জন, অমল আর তিতু;—নির্জ্জন নিশিতে অর্জ্জুন আর উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে। আর তখনই, পুব আকাশের দরগোড়ায় আঁধারে মাথাটি তুলে উঁকি মেরে দেখলো কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাদের সে মিলন। হেসে উঠলো দুষ্ট চাঁদ;—আর চাঁদের সেই হাসির আলোকে অমল চিনলো তিতুকে, আর তিতু চেয়ে দেখলো শান্ত সৌম্যোজ্জ্বল ধনঞ্জয় মূর্ত্তি। দু'জনেই যেন আজ প্রথম দেখলো দু'জনকে।

অবস্থা কাটিয়ে নিতে বিলম্ব হয় না তিতুর;—পথ ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন জানায় সে,—"এতটা রাত্রি হ'ল যে অমলদা?"

নারীর প্রশ্ন

—"কথা হচ্ছিল মিস্ সেনের সঙ্গে, তাই।"—সাইকেলটায় একটু ঠেলা দিয়ে জবাব দেয় অমল!

—"আশ্রমে নয় তবে!"—আপনমনেই এইটুকু শুধু উচ্চারণ করে তিতু।—সে কথায় কিছুমাত্র লক্ষ্য না ক'রেই যেন অমল এগিয়ে চলে সামে।—তেম্নি আপন মনেই অন্দরে চ'লে যায় তিতু।

সান্ধ্যকৃত্য সমাপন ক'রে ডেকে জানায় অমল,—"আমার খাবারটা পাঠিয়ে দাও তিতু,—ক্ষিদে পেয়েছে বড়।"

বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছিল তিতু, লাফিয়ে উঠলো তাই শুনে, —"সে কি! পুটি মাসী তবে খাবারটা নিয়ে রাখেনি ও ঘরে।"

খাবার আর জলের গ্লাসটা নিয়ে সে নিজেই গেল তক্ষুনি;—এ কাজটা যদিও আজ তার নূতন নয় একেবারে। তবু, যেন মনে হ'ল একবার,—"খাবারটাও কি ঠিক ঠিকমত রেখে দেওয়া হয় না তবে আজ কাল?—ছিঃ, কি মনে করবে তবে অমলদা। জ্যাঠাইমনি নেই ব'লেই কি এমন হচ্ছে?—আমরা তাকে আপনার জন করে না রাখলে সেই বা আর থাকতে যাবে কেন? আশ্রমবাসী, আশ্রমে ফিরে যাওয়াই স্বাভাবিক।"

অমল খেতে বসেছে,—পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জানায় তিতু,—"মিছেমিছি এতটা রাত্রি ক'রে ক্ষিদেয় কেন অযথা এতটা কষ্ট পান বলুন দেখি?"

—"ক্ষিদে একটু পেলেই কি আর সবাইকে উপেক্ষা ক'রে ছুটে আসা চলে অমি;—কি যে ছেলে মানুষের মত বল তুমি।"—স্নেহ মাখানো কণ্ঠে তিতুর উদ্দেশে বলে অমল।

নারীর প্রশ্ন

—"এর পরে শুধু শুধু আর রাত্রি করবেন না যেন।"—আব্দার মাখানো স্নেহ শাসন ফুটে ওঠে যেন তিতুর বাক্যে।

—"সত্যই, বড় বেশী বাড়াবাড়ি চলেছে আজ ক'দিন।"—খেতে খেতেই জানায় অমল।

—"অপনি কি ফিরে যাচ্ছেন আশ্রমে,—সত্যি করেই?"

—"সেই তো ভাবছি।" যেন একটু সমস্যা জড়ানো অমলের এ উক্তিটা।

—"না, না ;—সে হবে না। আপনাকে ছেড়ে জ্যাঠাইমনি একলা থাকতে পারবেন না এখানে।—আপনারা দু'জন মিলে এই সংসারাশ্রমেই থাকবেন এখানে। জ্যাঠাইমনি আপনাকে নিয়ে এসেছেন ;—কিন্তু, তিনি বাড়ী নেই ব'লে নিতান্ত অনাত্মীয়ের মতও থাকতে পারেন না আপনি। মা-ভাই-বোন যদিও আপনার কেউ নেই এখানে, আশ্রমের সেবা-যত্ন নিয়ে বোধ হয় সেবা করতে পারবো আমরা ; এবং সেই স্নেহ শাসন মেনে চলতেই হবে আপনাকে।"—বলতে বলতে স্বরটা যেন কেঁপে উঠছিল তার,—শেষের দিকটায়। আর, নিজেকে সে ব্যস্ত রেখেছিল 'হারিকেনের' চাবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আস্তে আলোটা ওঠা-নামা করিয়ে অযথাই শুধু।

এই অনুশাসনে বিহ্বল- হ'য়ে মুখ তুলে চাইতেই চোখোচোখি হয় দু'জনে ;—লজ্জিতা বোধ করে তিতু আজকের এই অভিভাবিকার ভূমিকায়।- তাই, পাশ কাটাতেই যেন ব'লে বসে হঠাৎ,—"নাঃ ; বড় ক্ষিদে পেয়েছে আমারও! রান্না হ'য়ে এল বুঝি বা এতক্ষণ"?—ব'লেই আলোটা ঠিকমত বাড়িয়ে রেখে একরূপ ছুটেই পালায় সে।

কোন্ দিকে কিম্বা কোথায় গেল তিতু, অমল মেটেই লক্ষ করলো না সে দিকে।—সে শুধু তার পেছনে দৃষ্টি দিয়ে ভাবছিল ব'সে তখন এই মমতাময়ীর স্নেহাকর্ষণের স্বরূপটা; আর সেই সাথে পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় প্রাণ তার ভ'রে উঠছিল স্মরণ ক'রে,—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"

—(*)—

পঁচিশ

শ্রীমতি মলিনা সেনের মনে বিবাহ বিরাগ ছিল না, বিবাহ বিদ্বেষ ছিল। প্রথম জীবনে ময়লা রং এর জন্যই তার বিয়ে হয়নি;—পরে স্বাধীন জীবনে আবার একটা গণ্ডীর সৃষ্টি করতে মন যেন অস্বস্তি কল্পনাই করে,—যদিও তার সুষ্ঠু-অঙ্গ-শ্রী আর কার্য্যকুশলতা আকৃষ্ট করেছে বা কাউকে।

—'নারীত্বের সার্থকতা মাতৃত্বে, কিম্বা মাতৃত্বের বিকাশ নারীত্বে' —এ সমস্ত অযথা বিচারে আত্মবিব্রত না হ'য়ে মন যেন বলে,—"এম্নি ভাবেই যায় যদি দিন যাক না।"

নারীর প্রশ্ন

আজ কিন্তু মনের দরজায় একটা চিন্তা এসে এক একবার ঘা দিয়ে ফিরে।—'এই স্বাধীনতা, এই নিয়মহীনতা – ইহাপেক্ষা একটা নিয়মকে বরণ ক'রে গণ্ডীর ভিতরে চলাটাই যেন মিষ্টি,—একটা সার্থকতা আছে। উদ্দেশ্যহীন যাত্রার শ্রান্তি ক্লান্তি এনে দেয় সুস্থ সবল মনেও। তাই, আজ ব্যর্থতা কল্পনায় অসুখী বোধ করেন নিজেকে।

—'এ যাত্রা-পথে দরদী সাথীর অভাব নেই, কিন্তু, কেউ যেন চায় না, পরিনতির সন্ধান দিয়ে দায়িত্বভাবে আপনাকে জড়াতে। শুধু চল, আর চল,—যতক্ষণ শক্তি আছে। তারপর কোথায় এর শেষ,—কি এর পরিণতি!'

শ্রীমতী সেনের ভাল লাগে অমলকে। জীবন যাত্রায় তার সঙ্গ কাম্য,—মধুর ব'লে মনে হয়। এমন সাথীর সঙ্গে স্বাধীনতা হারিয়ে বাঁধা ছন্দের গতিতে চলার যে শৃঙ্খল বরণ,—সেটিও ভাল লাগে,—তাল-ছন্দ-মাত্রা বিহীন খেয়াল সঙ্গীতের চাইতেও, ছন্দ-মাত্রা-তাল সমন্বিত ধ্রুপদ গানও যেমন।- প্রাণ তাই জানাতে চায় করুণ আবেদন, কিন্তু, হারিয়ে যায় ভাষা।

মলিনা জানে,—অমলের পথে আবেদন তার ব্যর্থ হ'য়েই ফিরে আসবে শুধু। তবু, সে আশা ত্যাগ করতে পারে না সে, পাষাণ প্রতিমাকে প্রাণহীন জেনেও পূজারী যেমন তাঁর পায়েই বাসনা জানিয়ে চলে,—আশার সন্ধানে।

*　　*　　*

নারীর প্রশ্ন

অকস্মাৎ একদিন সংবাদ এল,—"৺কামাখ্যা হতে শিলংএ গৌরিশঙ্কর প'ড়ে আছেন রোগশয্যায়।"

সংবাদ পাওয়া মাত্র প্রস্তুত হলেন অমল;—শ্রীমতী সেনেরও বিলম্ব রইলো না সংবাদটি জানতে। তিনিও সংকল্প জানালেন সঙ্গ গ্রহণের।

কামাখ্যা এবং শিলংএর শোভা সন্দর্শনেচ্ছা অনেকদিন থেকেই জেগে ছিল অন্তরে,—এইবার উপযুক্ত সাথীও মিললো। তিনি আরও জানালেন,- "বিদেশে বিপাকে, —ভগবান না করুন, আপদ বিপদ সামলানোর মত অভিজ্ঞতা কি আর অমলের আছে,—না পুরুষেরাই তা পারেন।"

স্থির হলো—'বদরপুর—লুমডিং হিলসেক্‌সন' হয়েই যাবেন আসামের পথে।

কয়লা সঙ্কটে ষ্টীমার বিভ্রাট হেতু চন্দনগড় থেকে বেশ কিছুটা পথ 'মোটর' বাহনে অতিক্রম ক'রে ট্রেনে উঠলেন তারা। বদরপুর তখনও অনেকটা দূর।

রাত্রি প্রভাত হ'তেই বদরপুর পৌছিলেন অমল আর শ্রীমতী সেন। এখান থেকেই সুরু হয়েছে শুধু পাহাড়, পর্ব্বত আর বন। শিলাতলে ধরণীবক্ষে বিরাট বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা রয়েছে ষ্টেশনটির নাম,—'বদরপুর'।

পৃথিবীর এই বনসৌন্দর্য্য প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট করলো শ্রীমতী সেনকে। তার ভিতর-বাইরে দু'দিকেই আজ অজানার স্বপ্ন। কেবলই মনে হচ্ছিল তার, যেন সেও তক্ষুনি ছুটে চলে ঐ অজানা

আকর্ষণেরই পশ্চাতে ;- হারিয়ে ফেলে নিজেকে সেই 'পলাতকার' হরিণীর মতই।

এখান থেকেই 'হিল্‌সেক্‌সনের' সুরু। গাড়ী দাঁড়িয়েই ছিল, সূর্য্যোদয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রিদের বুকে ক'রে সু-উচ্চ চীৎকার ধ্বনিতে সবাইকে জানিয়ে দিল তার সু-দীর্ঘ পার্ব্বত্য যাত্রার অভিযান। তার পরেই, ধীর মন্থর গতিতে চলতে লাগলো বন, পাহাড়, পর্ব্বতের ফাটল আর সুড়ঙ্গ পথে,—বৃশ্চিক্ যেমন চলে আপন বাচ্চাগুলিকে বুকে ক'রে—দেয়াল গাত্রের ফাটল বেয়ে।

প্রথমে কিছুটা বনভূমি অতিক্রম করে গাড়ী প্রবেশ করলো পাহাড়ের বুকের ভিতরে ;- কোথাও মেঘ ছোয়ান পর্ব্বত কেটে সুড়ঙ্গ পথে, কোথায় সু-উচ্চ পাহাড়ের বুকচিরে সংকীর্ণ খাদে ;— আবার কোথাও—এক পাশে পর্ব্বতগাত্র বেয়ে বেয়ে;—ঠিক বিপরীত পাশেই বহুনিম্নে দৃষ্টি যেথায় হারিয়ে যায় অন্ধকারে।

রজতরেখার ন্যায় শুভ্র সলিলা পার্ব্বত্য নদী অসংখ্য উপলখণ্ডে প্রতিহত হয়ে ছুটে চলেছে ফেন বিকীরণ ক'রে। পরপারে,—শ্যামল পুলিনে তার ছোট্ট পাহাড়ী কুঁড়েখানি দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ী অধিস্বামীর সংসারটি বুকে ক'রে,—কল্পনা জগতের ছবির মতই।

তারই অদূরে আবার,- এক পাশে চলেছে সুদূর বিস্তারি সুশ্রী একখানি পাহাড় ক্রম-উঁচু হ'য়ে। ঘাস বিছান শ্যাম অঙ্গে তার, পায়ে-হাটা পথটি নিপুণ পরিপাট্যে আপাদ মস্তক জড়িয়ে উঠেছে টিয়ে রংএর শাড়ীর শুভ্র পাড়ের মত।

নারীর প্রশ্ন

এমনি সুশ্রী আর সুবিন্যস্ত ক'রে প্রকৃতিরাণী সাজিয়ে তুলেছেন তার এই মানস উদ্যানখানি,—দেখলে স্বতঃই মনে হয় মানুষের যে কোনও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি পরিকল্পনা কত তুচ্ছ, বিশ্বশিল্পীর সৌন্দর্য্য সৃষ্টির কাছে। এতটুকু জঞ্জালের লেশ নেই তাতে;—প্রকৃতির মালি বুঝি বা নিত্য এসে ছেটে, ধুয়ে মুছে ঝাট দিয়ে রেখে যায় তাকে। এমনি পরিচ্ছন্ন বনসঙ্গিনীর এই মহান আসনখানি।

সুড়ঙ্গ একটি নয় দু'টি নয়, অনেক; একটি বা 'সারা' 'হার্ডিঞ্জ' ব্রীজকেও হারমানিয়ে দেয় দৈর্ঘে। একদিকে, বিশ্বস্রষ্টার মহিমার কাছে ভক্তিতে আপনি যখন মাথা নত হ'য়ে যায়, অপরদিকে তেম্নি কত নূতন আশায় বুক ভ'রে ওঠে মানুষের বিজ্ঞান বুদ্ধিকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে!

দিনের বেলাতেই আলো জ্বলছে গাড়ীতে,—কাটল-পথে আর সুড়ঙ্গ ভিতরে ধোঁয়া আর অন্ধকার মিলে পাতালপুরীকেও হার মানিয়ে দেয় ব'লে।

এই বিরাটের বুকে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে গাড়ী ছুটেছে আপন গতিবেগে, আর তারই ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে ব'সে আছে অমল আর মলিনা;—অমলের দৃষ্টি বাইরে নিবদ্ধ।

একটি সুড়ঙ্গমধ্যে গাড়ী প্রবেশ করতে যাবে, আর তখনই তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল নগ্নদেহ, নগ্নপদ, কটিতট আচ্ছাদন মাত্র বিশাল কাটারী হস্তে রূপকথার দৈত্যের মতই এক পাহাড়ী। এই বিশাল নির্জ্জন পর্ব্বত মালার মধ্যে তার নির্ভীকতার কল্পনাই করতে

পারে না সে। তাই, ঔৎসুক্যে শ্রীমতী সেনকে ডেকে দেখায় সে মূর্ত্তিটি।

শ্রীমতী মলিনা মুখ বাড়িয়ে দেখলেন তাকে। কল্পনায় এল বুঝি বা নদীসৈকতের সেই ক্ষুদ্র গৃহখানি; বল্লেন,—

—"হয়তো কোথায় পাহাড়ের কোলে নিভৃত ছোট্ট কুটির খানিতে প্রতীক্ষায় রয়েছে ওর প্রিয়া,—একাকী নির্জ্জনে,—এম্নি নির্ভীকা, —স্বাধীনা। কি মধুর এম্নি জীবন!"

—"মধুর কি শুধু কল্পনায়;—পারেন এখানে এম্নি জীবন যাপন করতে?"—সহজভাবে সুধায় অমল।

—"পারবো কি না জানিনা: কিন্তু লোভ হচ্ছে বড়ই।"

—"ভয়?"

—"আপাততঃ একটুও স্থান পাচ্ছে না প্রাণে। সঙ্গীহীন না হ'লে সে চিন্তা স্থান করতে ও পারবে না মনে হয়। আর, সে সঙ্গীটি যদি হন পরমাত্মীয়, তবে এই বিরাট সৌন্দর্য্য সম্ভোগে ভয় বা ক্লান্তি স্থান পাবে না কখনও,—সমস্ত দায়িত্ব নির্ভর রেখে তারই উপরে।"

অমলকৃষ্ণ তেম্নি চেয়ে আছেন বনসৌন্দর্য্যের মাঝে;—শ্রীমতী সেন একটু থেমে ব'লে চলেন আবার,—"আজকের এই চলার যদি না হ'ত শেষ! মন চায় আমার শুধু অসীমের পানে চলতে।"

—"অন্তহীন এম্নি বিরাটের বুকে আমারও ভাল লাগে চলতে।" —বাইরে দৃষ্টি রেখেই জানায় অমল।

নারীর প্রশ্ন

—"তবে চলবার একজন সাথী পাওয়া গেল।"

—"কি রকম?"

—"আমি ভেবেছিলাম, বুঝি বা রুচিটা আমারই অদ্ভুৎ, তার বুঝি আর জুড়ি নেই।"

—"অনন্তের আহ্বানে একলা চলারও একটা আনন্দ আছে।"

"সাথী যখন প্রাণের কাছেই একজনা মিলেছে, সুতরাং, এতদিন যে সৌন্দর্য্য দেখার লোভ নিয়ে এখানে এসেছি সে সৌন্দর্য্য সম্ভোগের আর মিথ্যা সঙ্গীবিহীন কল্পনা স্থান দিচ্ছি না মোটেই।"

গাড়ী ছুটেছে; অমল তার চোখদুটি ডুবিয়ে রেখেছে বনশোভার রহস্যে। শ্রীমতী সেনের অন্তর বাহিরে দুদিকেই আজ নূতনের স্বপ্ন, প্রাণ তার জানাতে চায় কত ব্যর্থ আকাঙ্খার বাণী। অন্তর তার বলতে চায়, —"বান্ধবহীন জীবনে, অসীম যাত্রাপথে সাথীর প্রয়োজন তুমি না বোধ করলেও একলা চলার আনন্দ আজ আর আমার নেই। সঙ্গীকে শুধু সঙ্গী নয়,—একান্ত আপনার ক'রে নিয়ে আশা-নিরাশায়, জীবন-মরণে সমব্যথা বয়ে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছানোতে যে আনন্দ, অনন্তকাল একলা চলার উৎকট উল্লাস তার কাছে অতি তুচ্ছ।"

আজ তার আরও মনে হ'ল, "এই শান্তি সুখ পথের সরল সন্ধান জানিয়েছে একমাত্র সনাতন আর্য্যশিক্ষা। পুরুষ প্রকৃতির স্বতঃ কাম্য সঙ্গ বেঁধে দিয়েছেন এমন অবিচ্ছেদ্য ক'রে যে, জীবনে মরণে,—মহাযাত্রার পরপারেও—তার বিচ্ছেদ ঘটেনা কোনকালে। তাই স্বামী স্ত্রী শুধু ইহকালের ভোগের বান্ধব-বান্ধবী নয়,—পরকালেরও। স্ত্রী,—

ধর্ম্মের, পাপ-পুণ্যের অংশভাগিনী,—অর্দ্ধাঙ্গিনী। সে সঙ্গ,- বন্ধন ছিন্ন করবার সামর্থ্য নাই কোন রাজনৈতিক আইনের, শমনের চরম দণ্ডেরও। বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে না কোন ডাইভোর্স,- তালাক নামা,—মৃত্যুও।

হিন্দুর বিবাহ বন্ধন এত নিবিড় যে মৃত্যুর পরপারেও সাবিত্রী চলেন সত্যবানের সাথে; বেহুলা,—লখাই এর মৃত্যুকে পরাজিত করে। জগৎ পিতা,- সতীর শব কাঁধে ক'রে প্রলয় নর্ত্তনে জগতে সঞ্চার করেন নবীন স্পন্দনের; পুত্রের নয়, কন্যার নয়, পিতা-মাতার নয়, —বিবাহিতা স্ত্রীর।"-

মানবের ভাষায় রূপ দিয়ে সে এবার জানায় তার অন্তরের ভাব,- "আচ্ছা বলুন দেখি, যাত্রা যদি হয় এম্নি অসীম, সঙ্গীবিহীন, সে যাত্রা কি সত্যই ভালো লাগে আপনার? চিন্তা, দুর্ভাবনা, সঞ্চার করে না প্রাণে নিরানন্দের।

"যখনই চলি, সঙ্গীর অপেক্ষা রাখি না আমি; যাত্রা সসীম, অসীম কিম্বা পথ হোক না কেন যতই বন্ধুর। দুর্ভাবনা, ভয় মোটেই স্থান পায় না হৃদয়ে শুধু এই কথাটী স্মরণ ক'রে যে, যেদিন কোন অজানা পৃথিবী থেকে অসহায় দুর্ব্বল আমি কোন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এলাম এখানে,—বুদ্ধিহীন, সঙ্গীহীন,- চেষ্টা বিহীন নিরাপদ অবস্থার মধ্যদিয়ে।- আবার যেদিন চলে যাব কোন অজানা দেশে,— কোন অন্ধকার কিম্বা আলোকের রথে, মরুময় কিম্বা নন্দনের পথে,— —একান্ত অসহায়,- প্রিয়তম সঙ্গীটিকেও রেখে;—কে নিয়ে যাবে

সে অচেনা পথে সঙ্গী হ'য়ে পথ দেখিয়ে,– সেদিন আমার এই বুদ্ধি আর দেহ স্বাধীনতাটুকুও ফেলব হারিয়ে।

জীবন মরণের দুইটি শ্রেষ্ঠ যাত্রাপথেই চলতে হবে নিঃসঙ্গ একাকী। তবে, আজ কেন আর নিজের বিবেক বুদ্ধি, শারীরিক স্বাধীনতা নিয়েও ব'সে থাকবো সঙ্গীর অপেক্ষায় চির একলা চলার আনন্দকে ক্ষুণ্ণ ক'রে – মিথ্যা দুশ্চিন্তা আর ভয়কে প্রশ্রয় দিয়ে? তাই, আমি চলতে চাই, চ'লে আনন্দ পাই একা,– জনমে-মরণে যিনি একমাত্র সাথী, জীবন যাত্রার সমস্ত সুগম দুর্গম পথে শুধু তাঁকেই আশ্রয় ক'রে প্রিয় সঙ্গীটি জেনে। – তাই- নির্জ্জনেও পাই আমি আনন্দ ; নিজেকে একলাটি কল্পনা করি না কখনও।"—

প্রাণ কেঁদে ওঠে মলিনার, অন্তর তার বলে,—"ওগো দেবতা একলা চলার সঙ্কল্প নিয়ে আমিও চলেছিলাম জীবন পথে, কিন্তু, সে চলার যে ভুল তা ভেঙ্গে গেল আজ তোমার একলা চলার সত্যের সন্ধানে।—আজ তোমার সঙ্গে আমাকেও এক ক'রে নাও ; তাতে তোমার সে যাত্রার ব্যাঘাত হবে না এতটুকু। আজ এই বিরাটের বুকে অজানা অচেনা আনন্দের সঙ্গীটি ক'রে নিয়েছ, চিরসাথী করে সত্যের সন্ধানপথে আমার হৃদয়েও একটু আলোক পড়তে দাও। সার্থক কর আমার একলা চলার সাধনা।

শ্রীমতী সেনের চিন্তার বিরাম নাই ; গাড়ী ছুটেছে অবিরাম গতিতে। এরই মধ্যে একবার গাড়ীর বাঁশী উঠল বেজে ; দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে জানায় অমল, "এই সেই হাফলং।

নারীর প্রশ্ন

অপরূপ দৃশ্য! ষ্টেশনটি দাঁড়িয়ে আছে নীরব নির্জ্জনতার মাঝে গুটিকতক জনমানব নিয়ে, প্রকৃতির স্তূপীকৃত সৌন্দর্য্যের স্পন্দন সৃষ্টি ক'রে। একদল খাসিয়া ছোট ছেলেমেয়ে ইউরোপীয় পোষাকে 'স্কাউট' সেজে সারি বেঁধে ঘুরে ঘুরে নেমে আসছিল উপর থেকে পাহাড়ের গায়ে জড়িয়ে উঠা পথে, ষ্টেশনে তাদের পাদ্রী ইনস্‌পেক্টর সাহেবকে অভ্যর্থনা আর অভিনন্দন জানাতে।

ষ্টেশনে পাহাড়াদের ভুট্টা জাতীয় খৈ আর লাড়ু প্রভৃতি খাদ্য এবং কলা, কমলা ইত্যাদি ফল ব্যতীত আর বিশেষ কিছু খাবার দেখা গেল না।

আবার যাত্রা সুরু হ'ল সেই পার্ব্বত্য পথের, পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে। চমৎকার লাগে নীচের দিকে চাইলে! শত সহস্র ধন্যবাদ জানায় অমল মানুষের বিজ্ঞান বুদ্ধিকে আর একবার, যার জন্য সম্ভব হয়েছে আজ কত অজানাকে জানবার, কত সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার। কিন্তু হায়! মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি যে, আজ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সাগরের তলদেশে, পাতালে সর্ব্বত্র প্রকৃতিকে জয় করেও শান্তির চাইতে অশান্তিকেই আমন্ত্রণ জানাতে এই বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগ চলেছে পৃথিবীকে নরকে পরিণত ক'রে;—ইচ্ছা করলেই যখন সম্ভব হত তাকে নন্দনের শোভা আর অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সাজিয়ে তোলা!—

অমল এবার একটু শুয়ে পড়ে অলসতা বোধ ক'রে।—আর পর-মুহূর্ত্তেই জড়িয়ে পড়ে তন্দ্রার আবেশে। মলিনা ব'সে আছেন ঠিক

মাথার পাশেই,—দৃষ্টি নেমে আসে সেই তন্দ্রামগ্ন মুখখানার উপরে। মমতা জেগে উঠে প্রাণে।

সুন্দর মুখশ্রী, বিদ্যা, বিনয় সর্ব্বোপরি একমাত্র পরার্থপরতা নিয়ে এই বাঁধনহীন জীবনে এমন নিষ্কলঙ্ক সত্যের পথে চলেছে কোন আনন্দে! সে নিজেও তো এম্নি বাঁধনহীনা। তবে, সারা জীবন সত্যকে প্রবঞ্চনা ক'রে বরণ ক'রে নিয়েছিল কোন্ সাধনার আনন্দকে?—আজ সে স্পষ্ট বুঝতে পেল, এ সাধনার অন্তস্থলে ব্যর্থতার কি করুণ আর্ত্তনাদ। তাই, সে আজ ফিরে পেতে চায় আপনাকে পূর্ণতার মাঝে। তিলে তিলে নিজেকে বঞ্চনা ক'রে যে ব্যর্থ আনন্দ, প্রকৃতির যে বিনাশ সাধনা, কি সার্থকতা সে সাধনায়? আত্মদানেই তো সৃষ্টির বিকাশ; তবে কেন তার টুঁটি চেপে অনর্থ চেষ্টা এই আত্মদানের? পরাজয়ও যদি হয় এ পথে, তবুও যে সার্থকতা আছে এ পরাজয়ে,—অধীনতায়। জীবনের মাঝখানে এসে এ অভিজ্ঞতা জ্ঞানলাভ হ'ল তার। এখনও সময় আছে, জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায়নি এখনও। এই বিরাট হিমাদ্রির নিবিড় প্রাকৃতিক শোভায় অনুকূল সঙ্গীর সান্নিধ্য সাহচর্য্যে—আজ পরিচয় প্রকাশ পেল তার অন্তরের;—পূর্ণতা কামনায় অধীর হয়ে উঠলো তার নারীত্বের।

চিন্তা স্রোতে অধীর হ'য়ে কখন সে হারিয়ে গেছে নিজেকে। বুকের ভিতরে সুদীর্ঘদিনের ঘুমন্ত দৈত্য আজ কুম্ভকর্ণের মত জেগে উঠেছে অনন্ত ক্ষুধা নিয়ে;—সে দানবের কাছে হার মেনেছেন মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র, পরাজিত হয়েছে তার তপস্যা। আজ এখানেও শ্রীমতী সেন বিজিতা।

অতি সন্তর্পণে ডান হাতখানি অমলের ললাটের ঊর্দ্ধদেশে রেখে সোহাগভ'রে চুলের ভিতর দিয়ে ক্ষুদ্র আঙ্গুলগুলি চালনা করতেই তন্দ্রা টুটে চোখ খুলে যায় অমলের।

চেয়ে করুণার যে ছবিখানি দেখলো,—কতকালের পরিচিতা ;—পরমাত্মীয়া কে যেন অপলক নেত্রে তার মুখপানে চেয়ে ব'সে আছে অন্তরের স্নেহ মমতা নিয়ে। এমনটি বুঝি সে দেখেছিল সেই শৈশবে সেদিন,—যেদিব মাকে সে হারায়নি তখনও।—অমলের নিদ্রালস চোখদু'টি আবার তেম্নি বুজে যায় আস্তে।

মলিনা চেয়ে থাকে নির্নিমেষ নয়নে ;—আমায় চিনলে না বুঝি কি করে জানাব আমার পরিচয় ? এত কাছে পেয়েও চিনতে পারলে না আমায় !—অভিমানে গুমরে ওঠে সমস্ত বুকখানি।

—(*)—

ছাব্বিশ

দুর্ভিক্ষ এখন 'ক্রনিক ম্যালেরিয়া'র মতই মানুষের গা-সহা হ'য়ে গেছে। অপথ্য-কুপথ্যের মত অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে বিচার বিবেচনার অপেক্ষাও যেমন রাখে না, তেম্নি, তাকে জীবনের আমরণ সহচর জেনে যন্ত্রণা ভোগেও উদাসীন হ'য়ে পড়েছে।

বাঙ্গলা ১৩৫০ সন থেকে রিণির বাবা এ যাবৎ কায়ক্লেশে সংসার চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু, এখন আর পেরে ওঠেন না। তৈজস-

পত্র প্রায় সমস্তই নিঃশেষ হয়েছে; কতকগুলি উদরান্নের সংস্থানে আর কতকগুলি দস্যু-তস্করের হাতে। জমি-জমার শস্যাদিও আর তেমন বুঝে পাওয়া যায় না;— অনাহারও এখন করতে হবে বৈ কি!

কবিরাজ মহাশয় ছোট গৃহস্থ। একখানি আখের ক্ষেত করেছেন, স্বাধীন রাষ্ট্রের ছেলে আর কিশোর যুবকের দল স্বাধীনতার আনন্দে কবিরাজ মশাহয়ের আখ চুরি ক'রে খেয়ে সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার মধুর আস্বাদ প্রাণভ'রে উপভোগ ক'রে চললো। জমির দুরবস্থা দর্শনে গ্রামের মাতব্বর ডেকে নালিশ জানাতেই ডাক পড়লো ছেলেদের। শাসন করতে গিয়ে জানিয়ে দিলেন মাতব্বর,—"যত সব নচ্ছাড় ছেলের দল,— আখ চুরি করে খেতে যাবিনে যেন চোরের বদনামী নিয়ে। খেতে যদি তেমন ইচ্ছে হয় দু'একখানা ক'রে এম্নি নিয়ে খেলেই তো পারিস।— সাবধান; চুরি ক'রতে যাবিনে যেন ফের!"

শাসানি বুঝে চলে গেল ছেলের দল; কোবরেজ মহাশয়েরও চুরির এত্তালার পথ বন্ধ হ'ল একেবারে। কিন্তু, শেষ পর্য্যন্ত শুধু বন্ধ হ'ল না আখ নিঃশেষ হওয়া। শাসন ব্যবস্থায় চুরি না হ'য়ে যখন তখন এম্নিই সদগতি হ'য়ে চললো তার।

তদুপরি, যে কাণ্ডের ফলে 'দিল্লীচুক্তি' সম্পাদিত হ'ল তাতে আরও বিচলিত হ'য়ে পড়লেন তিনি। এবং, এরই মাসকয়েক পরে কোবরেজ মশাইকে দিশেহারা ক'রে তুললে 'লক্ষ্মিমণির' নিরুপায় ধর্ম্মান্তর বিবাহ সংবাদ। বিবাহ যোগ্যা কন্যা নিয়ে, বিশেষতঃ, বড় কর্ত্তার অভাবে আর মোটেই থাকতে সাহসী হলেন না এই অবস্থার মধ্যে।

নারীর প্রশ্ন

অনাহার সইবার ক্ষমতা থাকলেও স্ত্রী-কন্যার অসম্মান সহ্য করবার শিক্ষা আজও তার লাভ হয়নি পাড়াগ্রামে থেকে,– সম্ভবতঃ, গদী-পার্শ্বস্থিত শিক্ষাভাব জনিত সংস্কারান্ধতায়। তাই, পিতৃ-পিতামহের ভিটায়,–'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমিতে শেষ অবধি প'ড়ে থাকবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও ঘটনা চক্রে আর পেরে উঠলেন না,– সু-দূরস্থ নেতাদের উৎসাহপূর্ণ বাণী শুনে শুনেও।

বাস্তত্যাগ করেও যে সুখ হবে না, সে কথাও তিনি বুঝলেন। তবু, আশৈশবের ধর্ম্ম ও সম্মান বোধকে বলি দিতে পারলেন না জন্মভূমির গভীর মায়ায়। অবশেষে একদিন অখাদ্য-কুখাদ্য আহার-দুষ্ট রুগ্না স্ত্রী-সন্ততি নিয়ে কায়কল্প-চিকিৎসা বিধান ও অনশন সমস্যা বিধান মানসে ডাক্তাররায় (ডাক্তার শ্রেষ্ঠ?) বিধানের আওতায় বাঙ্গলা বিধান পরিষদের শরণাপন্ন হওয়াই গতি স্থির করলেন।

কী যে মর্ম্মবেদনা নিয়ে শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত চিরকাম্য জন্ম-ভূমিকে পরিত্যাগ করতে চললেন, বঙ্গ-বিভেদকারী পাণ্ডারা তা বুঝবেন না। গৃহের ঠাকুর মণ্ডপ-তলায় শেষ প্রণাম জানাতে গিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়লো মাতা জন্মভূমির বুকে,– আর তারই করুণস্পর্শে ধরিত্রী মায়ের বুক থেকে উঠে এল ছোট একটি তপ্ত শ্বাস বাষ্পাকারে;- যেন অসহায় তার এই ছেলেটির জন্যই।

উদ্বাস্তু হয়ে এসে রিণির বাবা যা দেখলেন আরও নিরাশ হলেন তাতে। রুগ্না স্ত্রী পুত্রের চিকিৎসা বিধানের আশায় চেয়ে দেখলেন, ডাক্তার রায় এর চোখেই ছানি পড়েছে; নিজের চিকিৎসা বিধানে তিনিও এদেশ সে দেশ ক'রে বিব্রত।

নারীর প্রশ্ন

দুর্নীতি, অনাচার, লুণ্ঠণ, রাস্তাঘাটে মারামারি, নারীহত্যা প্রভৃতি যখন এখানেও লেগেই আছে দেখলেন, ছোট কবিরাজ হ য়েও তার বুঝতে বাকী রইলো না যে বিধান পরিষদেরও যথার্থ দৃষ্টি শক্তির অভাব।

যাই হোক, কিছুদিন মধ্যেই কোন এক বন্ধুর আশ্রয়ে স্বীয় ব্যবসায়ের চেষ্টা দেখলেন তিনি। শরণার্থী অসহায়ের দুঃখ দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করে শিউরে ওঠে রিণি; ওঃ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির এই পরিনাম।

প্রতিকারার্থে রেনুকা উৎসর্গ ক'রে বসে নিজের জীবন। রাস্তায় রাস্তায় বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়ায় বেঁচে থাকার মত দাবী প্রচার করে; দুর্দ্দশা অবসান কল্পে জনমত জুটিয়ে।

একদিন রিণি,- যখন দিল্লীচুক্তির আশ্বাসে নিজেরাও ফিরে যাওয়া স্থির করলো ইংরাজী ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মধ্যেই; এবং অনুরোধ জানাতে গেল দাঙ্গায় পিতৃহারা এক অনাথ শিশুর অসহায়া বিধবা জননীকে,- তার স্বামীর ভিটায় ফিরে পরিত্যক্ত সম্পত্তির সহজ সরল ব্যবস্থা পথ দেখিয়ে, চোখের জলে করুণ আবেদনে উত্তর এল অনাথার হৃদয় থেকে,

- "কেন মা আর অযথা ঠেলে দিতে চাও উপায়হীন ধ্বংসের হাতে? পিতৃ-পিতামহ, শ্বশুড়কুলের জীবন সাধনার সুখের সংসার হারিয়েছি প্রতিকার-বিহীন দস্যুতার বর্ব্বরতায়। সিঁথির সিঁদুর,— নারীর গৌরব বিলিয়ে দিয়ে এসেছি সে দস্যুতার চরণতলে। আর তারা সুখের সংসার গ'ড়ে তুলেছে আমারই চৌদ্দ পুরুষের শ্রমার্জ্জিত অর্থে। মা হ'য়ে,- এই অনাথ শিশুর মুখ চেয়ে চলে এসেছি এখানে

—রামরাজ্যে, একটুখানি আশ্রয়ের তরে শুধু। আর, এঁরা,- সীতা নির্ব্বাসনের মতই আমাদের পাঠাতে চান এই অনাথ শিশুর হাত ধরে অসহায় পরিবেশের মধ্যে। কিন্তু, বাছা!- জানি- হয়তো সেখানে গিয়ে স্বামীর রক্তমাখা শূন্য ভিটেখানি ফিরিয়ে পাব;- অসহায় শিশুটীকে খুঁদ-কুঁড়ো খাইয়ে মানুষ ক'রে আবার একখানি সুখের সংসার গ'ড়ে তুলবো। কিন্তু, মা!—তোমার দিল্লীচুক্তি সেদিনের জন্য পারে কি দিতে কোনও ভরসা;—যেদিন আমার কষ্টে গড়া ভাঙ্গা সংসার খানি আবার উথলে উঠতে দেখে ঝাপিয়ে পড়বে না আবার সে দস্যুবৃত্তি,—আমারই বাছার বুকে?

যদিনা সেদিনের জন্য কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারে তোমার ঐ দিল্লীচুক্তি,—যদি দর্শকের পর্য্যায় মাত্র গ্রহণ ক'রে চলেন সেদিনও এই উদ্বাস্তু হিতাকাঙ্খী নেতার দল, তবে তার চাইতে; বরং বনে গিয়ে অসভ্য বর্ব্বরদের মাঝে নির্ব্বাসিতার পর্ণকুটির গ'ড়েও মায়ের প্রাণ সুখী হ'তে পারবে পিতৃহীন সন্তানের তার মুখখানি চেয়ে,- স্বামীর শোক ভুলে।

আর যদি মা,- সেদিনের প্রতিকার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করতে পারেন তোমার ঐ দিল্লীচুক্তি, শক্তিমান হন দস্যুতা প্রতিকারের,—তবে এই মুহূর্ত্তে, এই অনাথা বিধবা আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে তাদের পরিত্যক্ত আবাসভূমিতে। কোন প্রয়োজন নেই শত-সহস্র শান্তি-কমিশন,আর অসহায় দিল্লী-করাচী সাক্ষাৎকারের; —ঐ নিরুপায়ের পশ্চাতে।

নারীর প্রশ্ন

আর তা যদি না হয়,—সত্যকারের প্রতিশ্রুতি ঘোষণায় শঙ্কা জাগে প্রাণে,—লক্ষ লক্ষ প্রচার প্রচেষ্টায়ও ফল হবে না এতটুকু।

আর যদি মা সত্যই না এখানেও স্থান হয় এই অনাথা আর অসহায় শিশুর, যদি ফিরতেই হয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে সেই স্বামীর রক্তমাখা শূন্য ভিটায়,—তবে তার চাইতে বাছাকে আমার আজই সঁপে দিচ্ছি,—নারীর লাঞ্ছনা, দুর্ব্বলের পীড়ন আর দস্যুতা প্রতিকার মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে দস্যু বিনাশিনী মায়ের চরণে,—মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেই।—বলতে বলতে অপূর্ব্ব গরিমায় উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে মায়ের মুখখানি সন্তান বলির আদর্শে;—অত্যাচার আর অনাচার প্রতিকার কল্পনায়।—স্তব্ধ হ'য়ে শোনে রিণি।

*　　　*　　　*　　　*

দেখতে দেখতে আসে পনরই আগষ্ট। মহানগরীতে উৎসব পালনের নানারূপ পরিকল্পনা। সে উৎসবে যোগ দিতে পারে না রিনি;—ব্যথায় ভ'রে ওঠে তার প্রাণ,—

—"এই কি স্বাধীনতা। এই পনরই আগষ্ট দ্বিখণ্ডিত ক'রেছে আমার জন্মভুমি,—বাংলা মায়ের বুক;—যে ভাঙ্গা বুকের ব্যথা কল্পনা ক'রে বাংলার শত শত মতৃভক্ত সন্তান আত্মাহুতি দান করেছে মায়ের বুক অখণ্ড রাখার সংগ্রামে। এই পনরই আগষ্ট করেছে আমাদের নির্ব্বাসিত, ভিখারী। পনরই আগষ্ট আমাদের ললাটে পরিচয় পত্র এঁটে দিয়েছে,—শরণার্থী,—দয়ার পাত্র। যাঁরা জীবনভর শরণ দিয়ে এসেছেন শত-সহস্র শরণাপন্নকে, অন্ন দিয়ে এসেছেন অনাথ আতুরকে,

— আজ তাঁরাই আশ্রয়হীন, অন্নহীন, শরণাপন্ন এই পনরই আগষ্টের কৃপায়। — ষোলই আগষ্ট যে বিষবৃক্ষ-বীজ বপন করা হয়েছিল 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' বন্য-মহোৎসবে, বর্ষপরে আবার সেই পনেরই আগষ্ট ফল-ফুল শোভিত হ'য়ে মাথাতুলে শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠল এই ভারতের মাটিতে, আর তারই নীচে বছরের পর বছর চলতে থাকলো 'বিষবৃক্ষের বনমহোৎসব', এই পনরই আগষ্ট দিনটিতে!

এই পনরই আগষ্ট আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আমাদের দাস-সুলভ দুর্ব্বলতা, এ'কে দিয়েছে ভারতের মুখে চিরকলঙ্ক কালিমা! — তাই, বুঝি বা অভিমানে ফিরে এলেন না ভারত মাতার দুরন্ত ছেলে এই লজ্জিত স্বাধীনতার মাঝে,— দুঃখিনী বাংলা মায়ের বুকে। চলে গেলন এই কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত মুখ দর্শনের পুর্ব্বেই!

চোখ দু'টি তার আজ আবার জলে ভরে ওঠে নেতাজীকে স্মরণ ক'রে।

—(*)—

সাতাশ

অমলকৃষ্ণ আর শ্রীমতী সেন তৃতীয় দিনে শিলং পৌঁছিয়ে দেখলেন যে বড়ই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন গৌরিশঙ্কর। চিকিৎসকের পরামর্শ-ক্রমে গৌরিশঙ্কর কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করলে, দিন কয়েক পরে প্রত্যা-বর্ত্তনই স্থির হ'ল। ইতিমধ্যে একদিন ৺কামাখ্যা দর্শন ক'রে এলেন শ্রীমতী মলিনা অমলকৃষ্ণের সাথে।

নারীর প্রশ্ন

বাল্যের সেই,—"গরমি যখন ছুটলো না আর পাখার হাওয়া সরবতে'' পত্ত থেকে যৌবনে প্রেমপিয়াসী অন্তরের পরিচিত "শেষের কবিতা"র শিলং এর সঙ্গে যখন বাস্তব পরিচয় লাভ হতে চললো, তার প্রতিটি ঝর্ণা, নায়ক নায়িকার প্রতিটি কুঞ্জ, প্রতিটি নির্ঝর ধারার সন্ধান আগ্রহ সোৎসাহ কৌতুক নিয়ে দেখা দিল শ্রীমতি মলিনার প্রাণে। সুদীর্ঘ দিনের কল্পিত আনন্দ আর বেদনা এক সঙ্গে উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়ে, চায় যেন মুক্তি পেতে। কল্পনা আজ সত্য হয়ে ফুটে উঠলো 'শেষের কবিতা'র,—বাস্তব-রূপ পরিগ্রহ ক'রে।

দীর্ঘকাল পরে গৌরিশঙ্করকে পেয়ে অমল প্রাণখুলে আনন্দ উপভোগ করে চলে ভগবানের সৃষ্টি বৈচিত্র আর মহিমা কীর্ত্তন ক'রে। আর, তাদেরই পাশে শ্রীমতী মলিনা সে সৌন্দর্য্যসুধা পান করে চলে নূতন প্রেমাস্বাদন মদিরায়।

এখানে পৌঁছিয়েই অমল মঙ্গল সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিল তিতুকে। এইবার প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদটি 'তারযোগে' পরিবেশন করে তাঁরা বাড়ী ফিরিলেন আমিনগাঁ পার্ব্বতীপুর পথে।

*   *   *

বাড়ী ফিরে গৌরিশঙ্কর গ্রামের যে দুরবস্থা দর্শন করলেন অতিশয় বেদনা বোধ করলেন তাহাতে। খাদ্যাভাব, অর্থসমস্যা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে লোক দেশান্তরে চলে যাচ্ছে হিন্দু মুসলিম্ নির্ব্বিশেষে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের আত্মরক্ষার সমস্ত সংস্থানই নিঃশেষিত

হয়েছে। সুতরাং, তাদের দেশান্তর গমনে তিনি বিস্ময় বোধ করলেন না।

এরই কিছুকাল পরে দিল্লীচুক্তির মূলীভূত কারণের তাণ্ডবে মানুষ পালাতে সুরু করলো দিশেহারা হয়ে। রিণির বাবাও বাস্তু-ত্যাগ করলেন এই সময়ে।

গৌরিশঙ্কর তাকে বাস্তুত্যাগ না করতে অনুরোধ জানালেন; কিন্তু, ভরসা দিতে পারলেন না নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে। বিশেষতঃ সেদিন হ'তেই তিনি এ বিষয়ে নিরাশা পোষণ ক'রে আসছিলেন,— যেদিন অতি অকারণেই রায়বাড়ীর আগ্নেয়াস্ত্রটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

তাঁর সরল বুদ্ধি তাঁকে যে শিক্ষা প্রদান করেছে, তা'তে নিজে বরং সর্ব্বপ্রকার বিপদের মাঝে দণ্ডায়মান থাকতে পারেন মান অপমান তুচ্ছ ক'রে,— অপরের ভরসাস্থল হয়ে;— কিন্তু, তাই ব'লে সে বিপদের মুখে অপরের মান-সম্ভ্রম এবং জীবন-মরনের ঝুঁকি আপনার কাঁধে বহন করবার মত শক্তি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত না থেকে, — পারেন না অপরকে সে লাঞ্ছনার মাঝে দাঁড় করিয়ে রাখার উপদেশ বর্ষনের স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করতে। তাই, তিনি বাধাও দিতে পারলেন না তাদের।

তাঁর আরও স্মরণ হ'ল যে, শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমিক, ভারতের অদ্বিতীয় বীর রানা প্রতাপসিংহ স্বীয় সহস্র দুঃখ-কষ্ট আর বিপদের মাঝে অবিচলিত থেকেও শেষ পর্য্যন্ত সেই বীরবর আর পারলেন না ধৈর্য্য রক্ষা করতে,— ক্ষুধার্ত্তা বালিকা কন্যার ম্লান মুখচ্ছবি দর্শন

ক'রে। ভুলে গেলেন জাতির গৌরব, ভুলে গেলেন স্বদেশ-প্রেম; —নতি স্বীকার করে লিপি পাঠালেন মোগলের কাছে,— যে মোগলকে উদ্দেশ করে একদিন ঘৃণা ভ'রে মহারাজ মানসিংহকে জানিয়ে ছিলেন তিনি,— "তুরুকের দাসের সঙ্গে চিতোরের মহারাণা আহার করতে পারেন না এক পংতিতে ব'সে।"— আর সেদিন বাৎসল্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করলো মহাবীরের স্বদেশ প্রেম।

আর, আজ যদি রিণির বাবার ন্যায় সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন বছরের পর বছর ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের মুখে দু'টি অন্ন দিতে না পেরে,— প্রাণপ্রিয়া কন্যা সন্তানের মর্য্যাদা রক্ষায় সন্দিহান হ'য়ে, নিরস্ত্র, নিরুপায় পরিবেশে না পারেন মাতৃভূমির প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ রক্ষা করতে; পরের হাতে সঁপে দিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন অন্যত্র, তাঁদের কি সত্যই উপহাস করা চ'লে 'ভীরু বাঙ্গালী বলে' 'লৌহ মানবের' স্পর্দ্ধায়?

হায় ভগবান! নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সজ্ঞান থেকে মানুষকে তুমি মানুষের হৃদয় বুঝতে দাওনি ব'লেই না বিশ্বে আজ এই বিপর্যয়!

—(*)—

আটাশ

বর্ষার শেষে চিরদিনের মতই দেখা দিল শরৎ;—কিন্তু দেখা দিল না শারদীয়া উৎসবের সেই প্রাণ ভরা আনন্দ। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে দেশ ছেয়ে গেল না! বুভুক্ষু রুগ্ন, আহত তাঁর সন্তানের গৃহে মা যেন এলেন লুকিয়ে,—বৎসরান্তে অসহায় ছেলেদের তাঁর দেখতে;—মণ্ডপ প্রবেশের অবৈধ অধিকার আতঙ্কে।

রায় বাড়ীতেও মা এলেন; কিন্তু গ্রাম আর তেমন আনন্দোচ্ছ্বাসে ভ'রে গেল না। চারিদিক শুধু ফাঁকা আর হাহাকারে পূর্ণ যেন! শানাই বাঁজতে গিয়ে হারিয়ে ফেলে ছন্দ;—ছিড়ে যায় সুর; প্রাণ খুলে বাজতেই যেন কেঁপে ওঠে শঙ্কায়!

কোনরূপে ক্রিয়া রক্ষা হ'ল। আর, তারপরে যা ঘটলো তাকেই বলে নিয়তি। এবং, এর হাত এড়িয়ে চলা মানুষের অসাধ্য। এই নিয়তির চক্রান্তেই তিতুর জীবন অধিকতর দুর্ব্বিসহ। এই নিয়তিই প্রতিপদে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে দানবীর কর্ণের জীবন-সাধনা। সে মহাবীরের জীবনী মহাকাব্যের কল্পিত অংশমাত্র বিবেচিত হ'লেও, তিতুর জীবন চন্দ্র সূর্য্যের মতই প্রত্যক্ষ সত্য।

মরা-কার্ত্তিক ও আবার এল। ঠাকুরমায়ের অসুখ বৃদ্ধি পেয়ে এতদিনে চলে গেলেন পরলোকে।

আর, দত্ত গৃহিণী তক্ষুনি একটা সান্ত্বনা-উল্লাস নিয়ে স্বামীকে খুসী করতে ভুল্লেন না যে, ভাগ্যে ঐ ডাইনী-পত্নীকে বৌ ক'রে ঘরে আনেননি তিনি। এ যাত্রার দৃষ্টিটা ঐ বুড়ীর উপর দিয়েই

গেল ; নইলে বাছার কি তার আর রক্ষে ছিল! ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই বৈ কি !

গৌরিশঙ্করের মাতৃভক্তি মোটেই ন্যূন ছিল না। মায়ের পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি কামনায় সন্তান হৃদয়ের অর্ঘ্য প্রদানকল্পে আত্মনিগ্রহেও তিনি বিন্দুমাত্র নিয়মহীন হলেন না। মাতৃ-দশার নিয়মগুলি পালন করলেন,— যথাযথরূপে।

শ্রাদ্ধাদির পরে গৌরিশঙ্করের অসুখ পুনরায় দেখা দিল। উপযুক্ত চিকিৎসক ও ঔষধ উভয়েরই সমস্যা। এবার তীব্র রক্ত আমাশয়।

আজ কয়েকদিন হয় তিনি শয্যা নিয়েছেন একেবারে।

–"নীলিমার বিয়ে হয়ে গেছে অশোকের সাথে, আনন্দেরই কথা। নইলে হয়তো বা তারই সাথে বিয়ে হতে পারতো তিতুর। তিনি হয়তো কালশয্যা গ্রহণ করেছেন,—এবং তাঁর অভাবে তিতুর বিয়ে হয়তো আর হবেই না বা।

তিতুর বিবাহ বৈরাগ্য তাঁরও অবিদিত ছিল না। এবং, উক্ত বিরাগ সত্ত্বেও সে যে জ্যাঠামশাইর কথা অবহেলা করতে পারে না, সে বিশ্বাসও তাঁর যথেষ্টই আছে। দেশের পরিস্থিতি হিসাবেও অসহায় সংসারে এত বড় কুমারী কন্যা নানারূপ দুর্ভাবনারই কারণ। সুতরাং, তাঁর জীবদ্দশায় না হ'লে নানা বিঘ্ন সংঘটনেরই সম্ভাবনা। কিন্তু, তেমন একটি ছেলের সন্ধানই বা মিলে কোথায় !

অমল কলেজে কাজ গ্রহণ করেছে ;— তাঁর মৃত্যুর পরে এ সংসার ছেড়ে নিশ্চই সেও চলে যাবে আশ্রমে। ঈদৃশ চিন্তার মাঝে, রায়

নারীর প্রশ্ন

বাড়ীর এই পোষ্যগুলির অসহায় অবস্থা পরিকল্পনা বিরাগী গৌরিশঙ্করের প্রাণেও মৃত্যুর ডাক শ্রবণে কাতরতা এনে দিল।

শ্রীমতী সেন প্রায় প্রত্যহই আসেন,—সেদিনও এসেছেন, রাত্রিতে গৌরিশঙ্করের রোগশয্যা পার্শ্বে উপবিষ্টা; অপর পাশে ব'সে তিতু হাত বুলিয়ে দিচ্ছে জ্যাঠামশাইর রুগ্ন শরীরে,—মন তার বেদনার চরমে আরুঢ়। অমল সে গৃহে প্রবেশ করতেই সস্নেহ ইঙ্গিত জ্ঞাপন করলেন গৌরিশঙ্কর;—তিতুর পাশেই বসে সে। মা এবং জ্যাঠাইমাও রয়েছেন সে গৃহে।

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে অমলের উদ্দেশে ব'লে চলেন গৌরিশঙ্কর, "মনে বড় ইচ্ছা ছিল যে, একটি আদর্শ সংসারাশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে তোমাতে আমাতে বাকী দিনগুলি কাটিয়ে যাব সেখানে। কিন্তু, ভগবান সে সুখটুকু আর দিলেন না। দেশ-কাল-পাত্র সবই যেন তাঁর ইচ্ছায়ই বিরোধী হ'য়ে বসলো। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে;—তাই আজ বড় দুশ্চিন্তা জেগে উঠেছে তিতুকে নিয়ে।"

একটু দম গ্রহণ করেন ক্লান্তি বোধেই যেন। ক্ষণপরে, ধীরে তিতুর হাতখানি আকর্ষণ করতেই সে এগিয়ে আসে সাম্নে। সস্নেহ কণ্ঠে আবার ব'লে চলেন গৌরিশঙ্কর,—"আমার মা-টি বড়ই অভিমানিনী! জানি ওর বেদনা কোথায়। আমরাই ওর প্রাণে এ বেদনাভিমান নীড় বেঁধে বসবার সুযোগ দিয়ে এসেছি,—কতকগুলি দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে, শাস্ত্রকে ভুল বুঝে। কিন্তু, আমরা ধন্য যে এযুগে আমরা জন্মেছি। আর, আমাদেরই যুগে এলেন সেই

নারীর প্রশ্ন

মহাপুরুষ যিনি শাস্ত্রের রহস্যদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে জগতের চোখে দেখিয়ে গেলেন আলোর সন্ধান। আমাদের প্রকৃত মুক্তি হবে সেইদিন, যেদিন আমরা বাঙ্গলার মহামানবের বাণী গ্রহণ করতে পারবো। তাঁদের আমরা বুঝতে পারিনি ব'লেই সর্ব্বশাস্ত্রদর্শিনী, সুবর্ণপ্রসবিনী অন্নপূর্ণা মা আমার কাঙালিনী।

বলতে বলতে চোখ দু'টি নিমীলিত করে কি যেন চিন্তা করেন ভাবের ঘোরে;—আর তার পরেই 'মা' "মা" রবে নীরবতাটুকু কাটিয়ে নেন ভাবেই যেন।

—"বড় দুঃখে মা আমার অভিমানিনী! কিন্তু, তা হলে তো চলবে না! নারীকে গড়তে হবে মা হয়ে। সন্তানের জননী হয়ে,—বাৎসল্য বুকে ক'রে জগতের সন্তানদের তার শিক্ষা দিতে হবে, এক হাতে অভয় স্নেহাশীর্ব্বাদ, অপর হাতে অসি নিয়ে,—পশুত্বকে বলি দিয়ে,—নির্ম্মমভাবে। তাই, জগৎ জননী মা আমার সন্তানের জননী, রুদ্র-ঘরনী, শক্তিময়ী;—পশুশক্তি বিনাশিনী দিগম্বরী" —বলতে বলতে চক্ষুর্দ্বয় পুনরায় নিমীলন করেন আস্তে।

মাথাটি নীচু ক'রে শুনে চলেছে তিতু। আজ সে কোথায়;—জ্যাঠাইমনিকে তো কোনদিন সে জানতে দেয়নি এতটুকু তার মনের ব্যথা! উঃ; কি ভুলই না সে করেছে জীবনে! এই জ্যাঠামশাইকে ঘরে পেয়েও দিনেকের তরে কোন শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করতে বসেনি সে। আজ জীবনটা তার শুধু অভিশপ্ত নয়, নির্য্যাতিত নয়,—প্রতারিতও।

নারীর প্রশ্ন

ধীরে ধীরে চোখ খুলে গৌরিশঙ্কর কি যেন হাতড়িয়ে চলেন,—যেন অন্ধকারে। অমলের হাতের ছোঁয়া পেতেই স্নেহভরে তুলে নেন সে হাতখানি। মুখপানে তার চেয়ে অসহায়ভাবে বলতে থাকেন তারপরে,—

—"হয়তো এ অনুরোধ কোনদিনই আমি তোমায় করতাম না, কিন্তু আজ আমি বড়ই নিরুপায়। এর প্রতিবিধান তোমাকেই করতে হবে।"—ব'লে তিতুর হাতখানি তুলে রাখেন সে হাতের উপরে ;— অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তার মুখপানে।

তিতুর সারাজীবনের বিদ্রোহ আজ আর জ্যাঠামশাইর অন্তিম অনুশাসনের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারছে না যেন। তেম্নি নীরবে মাথাটি নীচু করেই রাখে শুধু।—বিদ্রোহ, বেদনা, শোক সমস্ত মিলে তার কণ্ঠ রুদ্ধ ক'রে রেখেছে আজ।

সেই বেদনাক্লিষ্ট নীরবতার মাঝে একটি ক্ষুদ্রোজ্জ্বল আনন্দ-রশ্মির সন্ধানে দীপ্তাভ হ'য়ে ওঠে মায়ের মুখখানি।

অমলকৃষ্ণের চিরচিন্তা-বিহীন মুখের উপরে কি যেন একটা গুরু-চিন্তার ছাপ এসে পড়ে অকস্মাৎ ; অদ্ভূত অচিন্ত্যরূপে ;—প্রথমটায় সে যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লো। সমগ্র বিশ্বের, সমস্ত পরিবারের দায়িত্ব এই সংসারজ্ঞানহীন বেচারীর উপরে চেপে পড়লেও সে বোধ হয় ইহাপেক্ষা অধিকতর বিব্রত বোধ করতো না নিজেকে।

পরক্ষণে আপনাকে সংযত ক'রে সেও বলতে থাকে তেম্নি অসহায়ভাবে,—"আমার সব-কিছুই তো আপনার অজানা নেই!

সমস্ত জেনেও, আপনি নিজেও সে পথের পথিক হ'য়ে কেন আমায়—"

"আর আপত্তি করো না। আমায় স্বচ্ছন্দে, শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাসটি ফেলতে দিতে পার একমাত্র তুমি। আমি তোমায় নিখুঁতভাবে জানি ব'লেই এগুরু-ভার আজ তোমার হাতে সঁপে নিশ্চিন্তে যেতে পারছি।"— অমলের উক্তিতে বাঁধা দিয়ে অনুনয়ের সুরে কথা কয়টি বলেন গৌরিশঙ্কর।

—"আমার সন্ন্যাস!"— কাতরভাবে মিনতি জানায় অমল।

—"তোমার সন্ন্যাস, তিতুর পণ কিছুই আমার অজানা নেই। সে দুটোই আজ ভেঙ্গে দিয়ে যাচ্ছি আমি:— সে পাপের বোঝা আমার।"— দৃঢ়কণ্ঠে কথা কয়টি উচ্চারণ ক'রে স্বীয় মুষ্টির ভিতরে একটু দৃঢ়ভাবে চেপে ধরেন দু'জনার হাত দু'খানি। মুমূর্ষু মুখে তাঁর ফুটে ওঠে পূর্ণ অভিভাবকত্বের ছাপ। পরমুহূর্তেই শিথিল হ'য়ে পড়ে তাঁর সে রোগ-দুর্ব্বল মুষ্ঠি এই সংগ্রাম জনিত অবসাদে।—কিন্তু, অমল আর তিতুর মিলনহস্ত এতটুকুও বিচ্যুতি লাভের শক্তি সংগ্রহ করতে পারে না সে শিথল মুষ্টির মধ্যেও।

কিছুটা শক্তি সংগ্রহ ক'রে আবার ব'লে চলেন গৌরিশঙ্কর দুর্ব্বল কণ্ঠে,—"যোগিশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব মহাদেব মৃত্যুঞ্জয়ী হ'য়েও স্ত্রী পুত্র-কন্যা সব নিয়েই তাঁর সন্ন্যাস। সাধনা দ্বারা জীব যখন শিব-জ্ঞান লাভ করেন তখন সে নিজেও শিব হ'য়ে যান;— আর শুধু বলতে থাকেন,—

"ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা নমে জাতিভেদা পিতা নৈব মে নৈব মাতাচ জন্ম,
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যাশ্চিদানন্দ রূপোশিবোহম্ শিবোহম্।"

নারীর প্রশ্ন

বিশ্বের সমগ্র গরল পান ক'রে শান্তি দান করলেন পৃথ্বীকে। তাই, হররমা মা আমার মহাশক্তিরূপে শক্তি জোগাচ্ছেন তাঁর পাশে থেকে। আর তুমি কেন দুর্ব্বল বোধ করছো নিজেকে! এই মা-টি আমার সাক্ষাৎ উমা। শিব জেনেই সে ভার দিয়ে যাচ্ছি তোমায়। নইলে যে আর কেউ বইতে পারবে না। এগিয়ে এসো দু'জনে। উঠে বসবার শক্তিটুকু আমি হারিয়ে ফেলেছি, —এই শুভক্ষনেই তোমাদের আশীর্ব্বাদ করে যাই।"

আশীষ-হস্ত উত্তোলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র-মুগ্ধের মতই মাথা নত হ'য়ে এগিয়ে আসে অমল আর তিতুর। দু'জনার শির স্পর্শ করেন গৌরিশঙ্কর।

"ওদের আশীর্ব্বাদ করুন বৌদি, আপনারাও এইবেলা।"—ব'লে চোখ চাইতেই মা আর জ্যাঠাইমা আশীর্ব্বাদ করেন তিতু আর অমলকে। দুখের মাঝেও সুখ অনুভূত হয়।

শ্রীমতী মলিনাকে লক্ষ্য ক'রে মিনতির ভাবে জানান্ গৌরিশঙ্কর, —"আপনি রইলেন; আপনি তিতুর গুরু। শুধু তিতুর কেন, বাহিনী গ'ড়ে দেশের মেয়েদের যে আলোকের পথ দেখাবার ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাতে সকলের গুরুরূপে তাদের প্রকৃত সত্যের পথেই যে নিয়ে যাবেন এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। তিতু আপনাকে শুধু গুরু নয়, মায়ের মতই জানে। ওকে দেখবেন। আজ আমি চলেছি, তবু এ আনন্দ থেকে আমরা কেউ বাদ পড়বো না। আপনিও আশীর্ব্বাদ করুন ওদের।"

শ্রীমতী সেনের অন্তর-বেদনা যতই তীব্র হোক্ দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিলেন না তিনি। বললেন,—"এতটা ভেঙ্গে পড়বেন না আপনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন আপনি, আর সেই শুভলগ্নে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করবো উৎসবের মধ্যে। তবু, আজ আপনার সাম্নে আর একবার আশীষ পরশ দিচ্ছি এদের।"—ব'লে তিতুর মস্তক স্পর্শ করলেন। অমলের শির স্পর্শ করতে গিয়ে, হাতখানা কেঁপে উঠলো একটু,— সে শুধু উপলব্ধি করলেন নিজেই।

*　　　*　　　*

চিকিৎসক এসে নাড়ী দেখলেন ;—দুর্ব্বলতা বেড়েই চলেছে শুধু।

--(*)--

উনত্রিশ

ইহ-সংসারের মায়া-পাশ কাটিয়ে পরপারে চ'লে গেছেন গৌরিশঙ্কর।

শ্রীমতী সেন পূর্ব্ববঙ্গ ছেড়ে চলে এসেছেন কলকাতায়। অমল আর তিতু অসহায়ের আশ্রয় এবং ভরসাস্থল হ'য়ে রয়েছেন পূর্ব্ববঙ্গেই।

শ্রীমতী মলিনা কলকাতা এসে অসহায় উদ্বাস্তু মহিলাদের নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবার চেষ্টায় আছেন। জনাকয়েক মহিলা

নারীর প্রশ্ন

আর মেয়ে জুটেছেন ইতিমধ্যেই। শ্রীমতী সেনের পরিচালনাধীনে দু'পয়সা রোজগারের সন্ধানও পেয়েছেন তারা।

শ্রীমতী মলিনার বার-বারই মনে পড়ছিল রিণির কথা। অনেকদিন তাকে দেখেননি, ঠিকানাও জানা নেই। কেবলই মনে হচ্ছিল,—সমস্ত উদ্দেশ্য যেন তার সার্থক হ'তে পারতো রিণিকে শুধু পেলেই। পথে চলতেও তাই এক একবার ভীড়ের মাঝে খোঁজ নিয়ে চলেন রিণির।

ভীড় জমেছে সেদিন ;—ছোট একটি খোলা জায়গায় একটা উদ্বাস্তু বস্তীর পাশে, মাঝে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে বক্তৃতা ক'রে চলেছে একটি মেয়ে। জানিয়ে যাচ্ছে মানুষের শাশ্বত দাবী,—দরিদ্র জনগণের অধিকার।

ভীড় বেড়ে চলেছে ক্রমেই। সকলেরই মুখে চঞ্চলতা, আর সেই মুহূর্ত্তে একজন পুলিশ এসে বাধা দিলেন মেয়েটিকে,—চেষ্টা করলেন ভীড় ভেঙ্গে দিতে।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের পাগড়ীটা গেল উড়ে। সুরু হ'ল একটা 'হৈ চৈ' আর হল্লা। ডাণ্ডা হাতে এগিয়ে এলেন আরও জনা কয়েক পুলিশ, —তারপরেই চল্লো জনতার ভিতরে ক্ষণিক ধ্বস্তা-ধ্বস্তি। মেয়েটিরও মাথায় লেগেছে ভীষণ ; রক্ত ঝরছিল দুই একজন পুলিশের মাথা থেকেও। জনা কয়েক বন্দী ছেলেকে নিয়ে যখন তারা যাচ্ছিল থানার দিকে, মেয়েটিকে পাঠানো হ'ল হাসপাতালে।

নারীর প্রশ্ন

শ্রীমতী সেন পথ চলতে চলতে এসে পড়েছিলেন ঐ হাঙ্গামার পাশে —চেনা মুখ ব'লে মনে হচ্ছিল মেয়েটির। জনতার ভিতর ভাল দেখতে পাননি সে মুখখানি। একটা আগ্রহ নিয়ে—তাই তিনি যখন অনুসন্ধান করলেন হাসপাতালে, চমকে উঠলেন সীটের পাশে দাঁড়িয়ে।

স্নেহ'ভ'রে গায়ে হাত বুলাতেই চোখ মেলে তাকায় মেয়েটি। ক্ষীণ-কণ্ঠে জানায় সে, – "কে, মাসিমা ?"—

"হাঁ, আমি !"—বেদনামাখা কণ্ঠে জবাব দেন শ্রীমতী সেন—

"তিতুদি, মাষ্টার মশাই ?" ক্ষীণকণ্ঠ থেকে প্রশ্ন আসে আবার।

– "সবাই ভাল আছেন। দুঃখের ভিতরেও শুনে সুখী হবে যে, তাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে।"

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মেয়েটির ম্লান মুখখানি। শ্রীমতী মলিনা বলতে থাকেন তখন,—"তোমাকেই শুধু খুঁজে ফিরছিলাম আমি। ভগবান মিলিয়ে দিলেন, কিন্তু প্রাণে ব্যথা দিয়ে।"

শ্রীমতী সেনের পানে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক রে চেয়ে জনায় সে, "কি হবে আমাকে দিয়ে ? সর্ব্বহারাদের অভিযোগ, প্রার্থনা আজ বিশ্বের কানে পৌঁছায় না। বেঁচে থাকার দাবী জানাবার সুযোগ কিম্বা অধিকারও আজ আমাদের নেই। সে অভিযোগ জানাতে গেলেই আমরা হই অপরাধী।"

নারীর প্রশ্ন

শ্রীমতী সেন ইঙ্গিত জানালেন, "চুপ্! দুর্ব্বলতাই বাড়বে শুধু, সে সব ব্যবস্থা পরে হবে এখন।" নিতান্ত শিশুর মতই চোখ বুজে পড়ে মেয়েটি।

* * *

পরদিন সকালে দেখা গেল সংবাদ পত্রের একটা অনাড়ম্বর অংশে,— সহসা যেথায় চোখ পড়ে না, এই আড়ম্বরহীন সভার শেষ ফলটুকু,—

—"শান্তি ভঙ্গ অপরাধে জনা-কয়েক উদ্বাস্তু গ্রেপ্তার। একটি মেযে আহতাবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত। দুইজন পুলিশ আহত। পুলিশের মৃদু লাঠি চালনায় মেয়েটির আঘাত মৃদু। উদ্বাস্তু মেযেটির নাম রেনুকা।

—শেষ—